মুনীর চৌধুরী
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী
আনোয়ার পাশা

আকরম হোসেন
সম্পাদিত

বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুনীর চৌধুরী
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী
আনোয়ার পাশা

প্রকাশক
নীলিমা ইব্রাহিম
অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশ কাল
২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩৭৯
১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭২

প্রচ্ছদ
কালাম মাহমুদ

মুদ্রক
এ্যাসোসিয়েটেড প্রিন্টার্স লিমিটেড

মূল্য
আট টাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের উদ্যোগে
শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী মোফাজ্জল হায়দার
চৌধুরী আনোয়ার পাশা বক্তৃতা মালা
উনিশে মার্চ থেকে চব্বিশে মার্চ উনিশ'শ বাহাত্তর
ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
উনিশে মার্চ রবিবার সকাল দশটা

উদ্বোধনী ভাষণ

নীলিমা ইব্রাহিম

মাননীয় সভাপতি সাহেব, উপস্থিত সুধীজন ও আমার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

বাংলা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত অধ্যক্ষ মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী এবং অধ্যাপক আনোয়ার পাশা বক্তৃতা মালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্মরণ করছি সেই সব বরণীয় শিক্ষাবিদ এবং সাহিত্যিকদের যাঁদের শ্রম, যত্ন, ত্যাগ ও তিতিক্ষায় আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ বর্তমান গৌরবজনক স্থানে উপনীত হয়েছে। বিভাগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে প্রতি বৎসর এঁদের স্মরণে তাঁদের সাহিত্য কর্ম এবং জীবনাদর্শের আলোচনামূলক বক্তৃতা মালার আয়োজন করবে।

আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে নত মস্তকে, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে স্মরণ করছি মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী এবং আনোয়ার পাশাকে যাঁদের নিয়ে ক'দিন আগেও বাংলা বিভাগে আমরা ছিলাম এক। যাঁদের মুখের কথা নিয়ে আমরা কথা বলেছি, যাঁদের ভালবাসা পেয়ে গর্ববোধ করেছি, যাঁদের দুঃখ ও বেদনায় নিজেরা ব্যথিত হয়েছি, আজ নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে তাঁরা দূরে চলে গেছেন। বাংলা বিভাগে আর তাঁদের পায়ের ছাপ পড়বেনা, তাঁদের কণ্ঠ থেকে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য শুনবে না আর তাঁদের ছাত্ররা, স্নেহ-প্রীতির উচ্ছসিত আবেগে পূর্ণ হয়ে উঠবেন না আর বিভাগীয় অধ্যক্ষের কক্ষে অধ্যাপকবৃন্দ। অসময়ে আপন জন হারাবার বেদনায় আজ আমরা মূক। আজ কিছুক্ষণের জন্যে তাঁদের সান্নিধ্যকে ফিরে পাবার জন্যেই এ স্মৃতিচারণ। প্রতি বছর নবাগত ছাত্র ছাত্রীদের সামনে ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যক্ষ মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক আনোয়ার পাশার পরিচিতি এমনি করেই বিভাগ তুলে ধরতে প্রয়াসী হবে। যাঁদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, বাংলা বিভাগের অধ্যাপকরূপে যাঁরা মাতৃ-ভাষার মান রাখতে গিয়ে মাতৃভূমিতে রক্তরঞ্জিত হয়ে আত্মদান করেছেন তাদের স্মৃতি অমরতা লাভ করুক এ কামনাই করি।

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে মনে হয় মুনীরকে আমি দেখেছি সূর্যালোকে সূর্যকে দেখবার মতো। তার ভেতর দিয়েই তাকে চিনেছি। অমায়িক ব্যবহার, প্রাণোচ্ছল জীবন তরঙ্গ, নিরভিমান পাণ্ডিত্য, বন্ধুবাৎসল্য ও কৌতুকপ্রিয়তায় মুনীর আমাদের হৃদয়ের বড় কাছাকাছি ছিল। বিভাগে আমি তাঁর অধীনস্থ ছিলাম কিন্তু বড় বোনের সম্মান কতোটুকু পরিমাপ করতে পারিনি। মুনীর আমাকে যা দিয়েছেন তা আমার সহোদরের কাছ থেকে কখনও পাবো কিনা জানিনা।

বিগত ন'মাস দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট দিনগুলো ভাবতে গেলে কপালে ঘন বড় বড় স্বেদবিন্দুসিক্ত একখানা ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত মুখ আমার চোখের সামনে ভাসে। সে মুখে ঘরছাড়া আত্মজের চিন্তা, কারাগারে অবরুদ্ধ ভাই ও ভ্রাতৃবধূর জন্য আশঙ্কা, তাদের শিশু সন্তানের জন্য উদ্বেগ, হাসপাতালে শয্যাশায়ী স্ত্রীর জন্য দুশ্চিন্তা আর তার অপর বিভাগীয় সহকর্মীদের নিরাপত্তা,' কর্তৃপক্ষকে তুষ্ট রাখা ইত্যাদির কালো ছায়া বার বার সেখানে রেখাপাত করেছে। প্রতিদিন একটি প্রশ্ন ছিল আমাদের জন্যে, 'কালকের মতো আছেন তো?'

ডিসেম্বরের বার তারিখে আমাকে নির্দেশ দিলেন গৃহত্যাগের। দ্বিতীয়বার ফোন করে বল্লেন আমি যদি গুরুত্ব উপলব্ধি না করি তাহলে তিনি নিজে আসবেন। এই তাঁর শেষ উচ্চারিত স্নেহ কণ্ঠ। সে কণ্ঠ আজ চিরতরে মূক, আমাদের শ্রুতিশক্তির বাইরে।

মুনীর পণ্ডিত ছিলেন, ছিলেন অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণধী। তাঁর মীর মানস, বাংলা-গদ্যরীতি, তুলনামূলক সমালোচনা, তাঁর প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য বহন করছে। সেখানে তিনি ধীর স্থির অধ্যাপক যাঁর উচ্চারিত শব্দমালা বৃহৎ শ্রেণীকক্ষকে মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মতো শান্ত করে রেখেছে। সেখানে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্ভ্রমের ব্যবধান, শ্রেষ্ঠত্বের পার্থক্য।

নাট্যকার মুনীর চৌধুরী সকলের মুনীর ভাই। প্রচুর নাটক তিনি রচনা করেছেন, করতে চেয়েছিলেন আরও অনেক বেশী। রক্তাক্ত প্রান্তর, কবর, দণ্ডকারণ্য, দণ্ড, দণ্ডধর, চিঠি প্রভৃতির ভেতর নাট্যকারকে আমরা অনেক সহজে খুঁজে পাই। সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প রহিত মানুষের বন্ধু, ব্যথিতের দরদী মুনীর চৌধুরী রচনা করেছেন রক্তাক্ত প্রান্তর। আর অফুরন্ত প্রাণধারায় হাস্য কৌতুকে মেতে মুনীর ভাই লিখেছেন চিঠি, দণ্ড, দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি। দেশ সেবাব্রতী মুনীর রেখায়িত করেছেন 'কবর' নাটক।

একাধারে ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যে বুৎপত্তি থাকায় বেশ কয়েকখানা ইংরাজী নাটক তিনি অনুবাদ করেন এবং টেলিভিশনে সেগুলি সাফল্য অর্জনের

জন্য আরও নাটক অনুবাদ করতে শুরু করেছিলেন তিনি। গলস্ওয়ার্দীর সিলভার বক্স অবলম্বনে 'রুপার কৌটা' বার্ণাড্শ'-এর ইউ নেভার ক্যান টেল-এর অনুবাদ 'কেউ কিছু বলতে পারেনা' এবং সেক্স্পীয়রের টেমিং অব দি শ্রু অবলম্বনে টেলিভিশানের নাট্যরূপ 'মুখরা রমণী বশীকরণ' নাট্যকার মুনীর চৌধুরীর জন্য প্রচুর যশ আহরণ করেছিল। তাই তিনি সেক্সপীয়রের আরও কয়েকখানা নাটকে একসঙ্গে অনুবাদকের হাত প্রসারিত করেছিলেন।

সে সৃষ্টিশীল হাত আজ স্তব্ধগতি। ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে তাঁর 'চিঠি' নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। সেই নাট্যকারের প্রাণখোলা শেষ আনন্দ।

মুনীর নিজে অভিনেতাও ছিলেন। বেশী দিনের কথা নয় কৃষ্ণকুমারী নাটকে বলেন্দ্র সিংহের প্রাণবন্ত অভিনয় দেখেছি। শুনেছি ঢাকা বেতারে নোয়াখালির আঞ্চলিক ভাষায় সারেঙ্গ নাটকে কণ্ঠস্বর। তাঁর শিক্ষকতা পেশা না আটকালে হয়ত একদিন তাঁকে আমরা রূপালী পর্দাতেও দেখতাম। প্রচণ্ড প্রাণপ্রাচুর্য আর তীক্ষ্ণ ধীশক্তি তাঁকে সৃষ্টির এক অঙ্গন থেকে অন্য অঙ্গনে তাড়িত করেছে।

আজ শ্রদ্ধা জানাই অধ্যাপক, পণ্ডিত, নাট্যকার, ছোটগল্প লেখক, অভিনেতা মুনীর চৌধুরীকে আর অশ্রুবিন্দু উপহার দেই আমার সোদর প্রতিম মুনীরকে।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

শান্ত, ভদ্র, বিনয়ী এবং পরিশীলিত রুচির কোনও ব্যক্তি সম্পর্কে চিন্তা করতে গেলে অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর কথাই বিশেষভাবে মনে পড়ে। নিজের স্বভাবসুলভ কমনীয় আচরণে তিনি ছিলেন সবার প্রিয়। অজাতশত্রু অধ্যাপক চৌধুরী এমন নির্মমভাবে নিহত হবেন একথা কেউ কখনও ভাবতে পারেনি।

মোফাজ্জল হায়দার ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। প্রবেশিকা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচচ ডিগ্রী লাভ পর্যন্ত সর্বত্রই তিনি সম কৃতিত্বের দাবীদার। কিন্তু তাই বলে পাণ্ডিত্যের অভিমান বা অহঙ্কার তাঁর ছিল না।

ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যাপক চৌধুরীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর পরোপচিকীর্ষা। কেউ কোথায়ও বিপদে পড়লে একবার খবর পেলেই হ'তো, আহ্বান জানাবার আবশ্যক ছিল না। বিগত সংগ্রাম চলাকালে বিভাগীয় অধ্যাপক

রফিকুল ইসলাম যখন কারারুদ্ধ হ'লেন তখন তাঁকে মুক্ত করবার জন্য চৌধুরী সাহেবের কোনও এক উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন আত্মীয়ের কাছে তিনি বার বার গেছেন। তৎকালীন গভর্ণরের কোনও এক আত্মীয়ের কাছে তাঁকে অনেকবার বলতে শুনেছি 'রফিক তোমার শিক্ষক, তোমার উচিত তোমার চাচাকে গিয়ে সব বলা এবং ওর মুক্তির ব্যবস্থা করা।' এসময়ে ধৃত অধ্যাপকদের মুক্তি প্রচেষ্টায় তাঁর ব্যক্তিগত শ্রম ও আয়াসের কথা অনেকেই জানেন।

মোফাজ্জল হায়দার যখন গাড়ী চালিয়ে যেতেন তখন তার কোনও পরিচিত ব্যক্তির পক্ষে তাঁর সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাই গাড়ীতে কখনও তাঁকে একা দেখিনি। বহু ছাত্রছাত্রীকে অবলীলাক্রমে সঙ্গী করে তাদের গন্তব্য স্থানে পোঁছে দেবার দায়িত্ব তিনি হাসিমুখে বহন করেছেন।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ছিলেন কবিমনা সৌন্দর্য সচেতন স্বভাবের ব্যক্তি। ফুল বড্ড বেশী ভালবাসতেন। গত শরতেও রুমাল ভরে শিউলী ফুল এনে বিভাগীয় প্রধানের টেবিলে আমাদের সবাইকে ঢেলে দিয়েছেন।

বেশ কয়েক বছর আগেকার একটা কাহিনী মনে পড়ছে। অধ্যাপক চৌধুরী আজিমপুরে সরকারী বাড়িতে এক তলার ফ্ল্যাটে থাকতেন। আমরা মাঝে মাঝে ওঁর ওখানে যেতাম। ওঁর স্ত্রী বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। ডঃ ইব্রাহিম তাঁকে বাড়ির সামনের গাছটা কাটাতে বলেছিলেন। তাঁর মতে রোদের অভাবেই মিসেস হায়দার অসুখে ভুগছিলেন। অধ্যাপক চৌধুরী একটু চুপ করে থেকে বল্লেন, 'ডাক্তার সাহেব বাড়ীটাই বদলে ফেলি কারণ শিরীষের ডালে আমি আঘাত করতে পারবো না।' সেখানে অধ্যাপক অজিত গুহও উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার অসন্তুষ্ট হলেন, কিন্তু আমরা একটি সৌন্দর্যপিপাসু নিসর্গ সচেতন মনের পরিচয় সেদিন পেয়েছিলাম।

আজ বার বার নানা ব্যক্তিগত ঘটনাই আমার চিন্তার জগতকে আচ্ছন্ন করছে। যদি সময় পাই হয়ত সেদিন শোকবিহ্বলতা মুক্ত হয়ে তাঁর সামগ্রিক পরিচয় দিতে চেষ্টা করবো।

শান্তি নিকেতনের ছাত্র অধ্যাপক চৌধুরী ছিলেন নিষ্ঠাবান রবীন্দ্র ভক্ত। তাই পাকিস্তানের রবীন্দ্র বিরোধীদের সঙ্গে বার বার নানা ভাবে তাঁকে সংগ্রামে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। তর্ক বিতর্ক করেছেন সবার সঙ্গে, হার স্বীকার করেন নি। আপোষের প্রশ্নও সেখানে ছিলনা।

সৃজনী সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর 'রবি পরিক্রমা' গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলিকে এ গ্রন্থে একত্র সন্নি-বেশিত করা হয়েছে।

'সাহিত্যের নব রূপায়ণ' গ্রন্থে বঙ্গ সাহিত্যের বিভিন্ন লেখকের সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে।

'রঙ্গীন আখরে' ব্যক্তিগত প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এছাড়া ভাষা সম্পর্কিত তাঁর বহু আলোচনা রয়েছে। বিদেশীদের বাংলা শেখানোর আগ্রহে তাঁর 'কলুক্যাল বেঙ্গলী' গ্রন্থ রচিত হয়। স্বদেশ সেবার মানসিকতা নিয়ে তিনি দীর্ঘকাল বাংলা একাডেমীতে অবাঙ্গালীকে বাংলা শিখিয়েছেন।

অধ্যাপক চৌধুরীর পাণ্ডিত্যের তুলনায় তাঁর প্রকাশনা কম। হয়ত যে জীবনে তিনি সাহিত্য সাধনায় ও আত্মপ্রকাশে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন বিধাতা তাঁকে সে অবকাশের জীবন দিলেন না।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর সাহিত্য সমালোচনাতেও তাঁর ব্যক্তিগত মেজাজ পরিলক্ষিত হয়। সমালোচনায় তিনি সর্বত্র দরদী, তীক্ষ্ণ বিরূপ মন্তব্য তাঁর লেখনীতে আমরা খুঁজে পাইনা।

ছাত্র বৎসল অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীকে আমরা হারিয়েছি। তাঁর ছাত্র-ছাত্রী, সহকর্মী, ও গুণমুগ্ধ সুহৃদদের মাঝে তাঁর মৃত্যু নেই। সেখানে তাঁর স্মৃতি চির ভাস্বর, বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র ভক্ত ও সাধক অধ্যাপক চৌধুরী স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন এ ধ্রুব সত্যকে আমরা গ্রহণ করলাম।

আনোয়ার পাশা

অধ্যাপক আনোয়ার পাশার সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘকালের নয়। কিন্তু অল্পদিনের ভেতর নিজের অহমিকাশূন্য স্বভাবে তিনি আমাদের হৃদয় জয় করেছিলেন। আনোয়ার পাশার উজ্জ্বল এবং গভীর চোখের দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হয়েছে তাঁর কাছের সবাই।

বিগত সংগ্রামের ন'মাসে আমরা পরস্পরের নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছিলাম। বিভাগে কাছাকাছি বসে অনুচ্চকণ্ঠে মুক্তিবাহিনীর ক্রিয়াকলাপ আলোচনা করা এবং তাদের যোগসূত্রে নানারকম কাজে সহায়তা করতে গিয়ে আনোয়ার পাশাকে অতি কাছে পেয়েছিলাম। রোজ একবার বলতেন 'আর নয়, আপা, এবারে চলে যাবো। চলুন না আপনিও আমার সঙ্গে, আপনাকে কয়েক বছর খাওয়াবার মতো সামর্থ্য আমাদের আছে।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া আর হয়নি। গত ১০ই ডিসেম্বর তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। বলেছিলেন, 'আমি অতি সাধারণ

ব্যক্তি। আমাকে কে কি করবে। প্রাণ দিয়ে আনোয়ার পাশা প্রমাণ করে গেছেন তিনি অতি সাধারণ ব্যক্তি ন'ন, দেশপ্রেমে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবায় তিনি ছিলেন অসাধারণ।

আনোয়ার পাশা কবিতা লিখতেন, দুর্যোগের ভেতর একটা বাংলা টাইপ রাইটার কিনেছিলেন তিনি। কবিতা টাইপ করে এনে আমাদের দেখাতেন। একদিন বিরক্ত হয়ে বল্লাম, 'এর ভেতরও আপনার কবিতা লেখা আসে।' হেসে বল্লেন, 'কি যে বলেন আপা আপনাকে কি রোজ কবিতা দেখাই নাকি আমার টাইপ বিদ্যা কতোদূর এগুলো তাই দেখাই।'

হারিয়ে গেছে সেই সহজ, সরল, বিনয়ী মিষ্ট হাসি মুখের সুহৃদ এবং সহ-কর্মী। চেহারা দেখে মনে হ'ত তরুণ। তাই ক্লাসে ঢুকে বছরের প্রথম দিন বলে নিতেন, 'আমার বয়েস কিন্তু অনেক, আমাকে ছেলে মানুষ মনে করোনা।' এমন মানুষের ওপরেও পাকিস্তানী ঘাতকের অস্ত্র উদ্যত হয়েছিল। অপরাধ তিনি তাঁর জননীকে প্রাপ্য সম্মান দিতে চেয়েছিলেন।

স্বল্পকালীন সাহিত্য সাধনায় আনোয়ার পাশা অনেক পরিশ্রমের চিহ্ন রেখে গেছেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'নদী নিঃশেষিত হলে'। এ কাব্য গ্রন্থে কবি আশাবাদী, জীবন তাঁর কাছে অর্থপূর্ণ, শান্তির নীড়।

দু'খানা উপন্যাস আনোয়ার পাশা রচনা করেছেন 'নীড় সন্ধানী' এবং 'নিশুতি রাতের গাথা'। আনোয়ার পাশা পশ্চিম বঙ্গে জন্মেছিলেন। তাঁর পরিচিত পারিপার্শ্বিক এ উপন্যাস দু'খানার পটভূমিকা।

'রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা' আনোয়ার পাশার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এখানে সমালোচক অধ্যাপককেই শুধু আমরা পাইনি একজন নিষ্ঠাবান রবীন্দ্র সাহিত্য সাধককেও পেয়েছি। হয়ত এই রবীন্দ্র সাধনার পুরস্কার তাঁর অকাল মৃত্যু।

এছাড়া মরহুম অধ্যাপক আবদুল হাই সাহেবের সঙ্গে যুক্তভাবে তিনি কয়েক খানা গ্রন্থ সম্পাদনা করেন, এগুলির ভেতর চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কালকেতু উপাখ্যান, মানসিংহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আনোয়ার পাশার সাহিত্যকর্ম তাঁকে বাঙ্গালী পাঠক সমাজে চিরঞ্জীব করে রাখবে।

বন্ধু ও ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক আনোয়ার পাশার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের ভাষা আমাদের নেই। অল্প দিনে সবার অন্তর জয় করে তিনি আমাদের জন্যে এক বুক শূন্যতা রেখে গেছেন।

সর্বশেষে উল্লেখ করছি আমাদের এ বক্তৃতামালায় সর্ব মোট ছ'টি বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক শহীদ অধ্যাপকের জীবনী ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কিত

দু'টি করে আলোচনা নিয়ে মোট ছ'টি বক্তৃতার আয়োজন আমরা করেছি।

অবশ্য এ আলোচনায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করছেন তারা এখনও সদ্য শোকে কাতর তাই হয়ত বক্তব্যে আবেগপ্রবণতা বেশী থাকতে পারে। কারণ কোনও লেখক বা সাহিত্যিকের স্বষ্টির মূল্যায়ন করতে হলে যে সময়ের ব্যবধান প্রয়োজন সে সময় পেতে আমাদের দীর্ঘদিন লাগবে। তাই এ আলোচনায় ব্যক্তিগত পরিচয়ের ছাপ অধিক থাকাই সম্ভব।

এ বক্তৃতা মালায় যাঁরা পৌরহিত্য করছেন, যাঁরা প্রবন্ধ পাঠ করছেন, যারা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করছেন এবং যাঁরা উপস্থিত থেকে আমাদের মর্মবেদনার অংশীদার হয়েছেন তাদের সবাইকে আমি আমার এবং বিভাগীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি ভবিষ্যতে আপনাদের সবার কাছ থেকে এ ধরনের সহৃদয় সহানুভূতি লাভে আমরা বঞ্চিত হবো না।

ভাষণ

আহমদ হোসেন

ডঃ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুনীর চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে যে ঐতিহ্য স্বষ্টি করে গেছেন, তা সকলের জানা। ভাষা আন্দোলন ও পরবর্তী আন্দোলনে বাংলা বিভাগের যে ঐতিহ্য সেটা ছাড়া পরবর্তী কালে এই আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে অগ্রসর হত কিনা সন্দেহ। মুনীর চৌধুরী এ আন্দোলনের প্রধান নেতা। বাংলা বিভাগের অধ্যাপকেরা যদি সামান্যতম আপোষের মনোভাব গ্রহণ করতেন তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাস ভিন্নভাবে লেখা হতো। বিভিন্ন কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাংলা বিভাগের শিক্ষকেরা যে ভূমিকা পালন করেছেন তার পশ্চাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রভাব বিরাট। মুনীর চৌধুরী আমার ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু, মোফাজ্জল হায়দার চৌদুরী ভাইয়ের মতো, আর আনোয়ার পাশা আমার ছাত্র। তাদের অবর্তমানে যে শূন্যতার স্বষ্টি হয়েছে তা অপূরণীয়। এ তিনজনই ছিলেন আপোষহীন মনোভাবের অধিকারী। আমরা যদি এই আপোষহীন মনোভাব নিয়ে আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অগ্রসর হই তবেই তাদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হবে। এঁরা ছিলেন নির্লোভ। সুবিধাবাদী ছিলেন না এঁরা। আমাদেরও উচিত লোভ এবং সুবিধাবাদ পরিহার করে চলা।

ভাষণ

কবীর চৌধুরী

যাঁদের হারিয়েছি তাদের সম্পর্কে আলোচনা ও স্মৃতিসভা আমাদের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির সহায়ক হবে। যাঁরা আজ আমাদের মধ্যে নেই তাঁরা ছিলেন নির্লোভ। এদের আদর্শই ভবিষ্যতে বুদ্ধিজীবীদের আদর্শের পথে এগিয়ে দেবে। সব বুদ্ধিজীবী প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে না। যাঁরা প্রগতিশীল তারাই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। আগামী দিনের সংগ্রাম শোষণমুক্ত প্রকৃত স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করার সংগ্রাম। যাদের হারিয়েছি তাঁরা ছিলেন ত্যাগী ও নিঃস্বার্থ তাদের এই আদর্শ যেন আমাদের উদ্বুদ্ধ করে।

ভাষণ

সৈয়দ আলী আহসান

আমরা পৃথিবীতে কি চাই? আমরা সজীবতা চাই। আলো চাই, প্রাণ-চাঞ্চল্য চাই। কবি সাহিত্যিকেরাই পৃথিবীতে এই সচলতা সজীবতা আনয়ন করে। যে তিন জনের কথা আলোচনা করছি তাঁরা সবাই সাহিত্যিক ছিলেন- তাঁরা এই আলো ও সচলতা আনতে চেয়েছিলেন, আনতে চেয়েছিলেন জীবনানন্দ। তাদের সম্পর্কে আলোচনা করে আমরাই উপকৃত হব। বাংলা বিভাগকে এই আলোচনা সভা আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ।

প্রধান অতিথির ভাষণ

শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী

স্বাধীনতা আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা থাকে। এ ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা সে ভূমিকা যথাযথ পালন করেছেন। এদেশে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষে বুদ্ধিজীবীরা যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। তবে এর যে ব্যতিক্রম ছিল না তা নয়। অনেক বুদ্ধিজীবী পদমর্যাদা, লোভ ও মোহে পড়ে প্রতিক্রিয়ার কাছে নিজেদের বন্ধক রেখেছিল। এতে আমরা দুঃখ পেয়েছি অনেক, আমি কামনা করবো এর যেন পুনরাবৃত্তি আর না হয়। যারা সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশ-বাদের দালালী করবে তাদের প্রতিরোধ করা হবে। যাদের আমরা হারিয়েছি, আজ তাদের প্রয়োজন ছিল খুব বেশী। এখন আশা করবো আমাদের বুদ্ধিজীবীরা

আমাদের পরিচালিত করবেন যাতে আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই কিংবা স্তিমিত হয়ে না পড়ি।

সাধারণ মানুষ দেশের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে। আশা ভঙ্গ হলে বিক্ষোভ ও বিস্ফোরণ হতে পারে। কামনা করি দেশে যেন আর রক্তপাত না ঘটে। আগামী দিনের সংগ্রামে যেন আমাদের অতীত শিক্ষা কাজে লাগে। বুদ্ধিজীবীসমাজ যেন শহীদ বুদ্ধিজীবীদের কথা স্মরণ করেন। তাদের মনে রাখতে হবে আমাদের প্রয়োজনে, জাতির প্রয়োজনে।

বাংলা বিভাগকে এই আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানাই। শহীদদের আদর্শকে আমরা ধরে রাখব—এটাই আমাদের আজকের শপথ হোক।

সভাপতির ভাষণ

মযহারুল ইসলাম

মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে স্বাধীন বাংলাদেশে আমি সবচেয়ে বেশি খুশী হতাম। মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী আমার সহকর্মী। আনোয়ার পাশা পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসার পর আমি তাকে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে অধ্যাপনা করার সুবিধা করে দিই।

এই তিন মনীষী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনন্য ব্যক্তি ছিলেন। সব প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁরা তাদের লেখা, বক্তৃতার মাধ্যমে আমাদের স্বকীয়তা বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিলেন। ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরীর অবদান অতুলনীয়। বাংলা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত এ বক্তৃতামালার সাফল্য কামনা করছি।

মুনীর চৌধুরীর জীবনকথা

রফিকুল ইসলাম

উনিশে মার্চ রবিবার বিকাল চারটা

মুনীর চৌধুরীকে আমি প্রথম দেখি আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে। তখন তিনি সবেমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম. এ. পড়া শেষ করেছেন। ১৯৪৭ সালের কথা, সে সময়ে আমি স্কুলের ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতেই আমাদের বাড়ী থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র আমার অবাধ গতিবিধি ছিল। ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ে তখন এত ছাত্র ছিলনা, ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল আরও কম, মুসলমান ছাত্রী যে কয়জন ছিলেন তাদের হাতে গোনা যেত। মুনীর চৌধুরী তখনই একটি সুপরিচিত নাম, তবে ভাল ছাত্র হিসেবে নয়, অন্য কারণে। তিনি তখন রাজনীতি করতেন, শুধু সখের ছাত্র রাজনীতি নয়, পুরোপুরী বিপজ্জনক বামপন্থী রাজনীতি। তবে কেবলমাত্র সে কারণেই তিনি সেকালে ঢাকায় খ্যাতিমান ছিলেন না। তার জনপ্রিয়তার একটি কারণ হয়তো ছিল এই যে চমকপ্রদ কিছু ছোটগল্প ও নাটিকা তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু সে সময়ে তার জনপ্রিয়তার মূল কারণ ছিল তার অদ্ভুত বক্তৃতা করবার ক্ষমতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সে সময় পুরোপুরি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা শহরের বিদ্যায়তন কয়েকটিই কেবলমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত ছিল। আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক জীবন ছিল খুবই কমতৎপর। নাটক, তর্ক-বিতর্ক, সাহিত্য প্রতিযোগিতা আর ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলো ছিল খুবই জমজমাট। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাহিত্য প্রতিযোগিতা আর ভোজ অনুষ্ঠানগুলো খুবই আকর্ষণীয় হত। সাহিত্য প্রতিযোগিতায় আমরা দেখেছি মুনীর চৌধুরীর আধিপত্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিভিন্ন রাজনৈতিক সভাসমিতিতে তখন শুনেছি মুনীর চৌধুরীর অনবদ্য বক্তৃতা। তিনি সেকালে ইংরেজিতে বক্তৃতা করতেন, তখনকার রেওয়াজ ছিল তাই। কিন্তু মুনীর চৌধুরীর সরস কথকতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যেত, বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসমূহে। ক্রীড়ার অনুষ্ঠান ঘোষকরূপে

মুনীর চৌধুরী অনুষ্ঠান ঘোষণাকে এমন সরস ও কৌতূহল উদ্দীপক করে তুলতেন যে খেলার মাঠে সেটাই থাকত সব চেয়ে বড় আকর্ষণ। বলাবাহুল্য যে শীতের অপরাহ্নগুলোয় খেলার মাঠ মুনীর চৌধুরীর অনবদ্য বাংলা কথকতায় জমে উঠত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অনার্সের ছাত্র হবার আগে মুনীর চৌধুরী আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন ১৯৪১—৪৩ সালে। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯৪১ সালে ম্যাট্রিক পাস করে তিনি আলীগড়ে আই. এস. সিতে ভর্তি হন। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন আরও যে সব বাঙ্গালী ছাত্র ছিলেন তাদের মধ্যে মরহুম এ. টি. এম. মুস্তাফা এবং জনাব শামসুল হুদা চৌধুরীর কথা আমরা মুনীর চৌধুরীর মুখেই শুনেছি। ঐ তিনজনই ভাল বক্তা হিসেবে পরিচিত, জানিনা এ দক্ষতা তারা আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই পেয়েছিলেন কিনা। মুনীর চৌধুরী সাহেব বলতেন আলীগড়ে যখন তিনি পড়তেন তখন তার পরিচ্ছদ ছিল শেরওয়ানি ও আলীগড়ী পাজামা। আমি কিন্তু মুনীর চৌধুরীকে গত পঁচিশ বছর ধরে সাধারণতঃ পাজামা পাঞ্জাবী-তেই দেখেছি। পরিচ্ছদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম এ জন্যে যে এ বিষয়ে বহু বছর আগের একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। আজ থেকে প্রায় বিশ পঁচিশ বছর আগের কথা, ফজলুল হক হলে কি একটা সভা ছিল, সভার শেষে সন্ধ্যা বেলা হলের সামনে মুনীর চৌধুরী একটা সাইকেল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন সঙ্গে তার কিছু ভক্ত। কথা হচ্ছিল পোশাক সম্বন্ধে। মুনীর চৌধুরী তখন তরুণ যুবক, সুদর্শন, ছিপছিপে, সাইকেল ধরে দাঁড়ানো, পরনে সাদা পাজামা পাঞ্জাবী, চুলগুলো উদ্‌ভ্রান্ত, তিনি পাশ্চাত্য স্যুট কোটকে পরিহাস করে কথা বলছিলেন। তিনি বললেন স্যুট কোট পরলেই আমার মনে হয় খাঁচার মধ্যে, কারাগারে প্রবেশ করেছি। তার কিছু দিনের মধ্যেই তাকে কারাগারে যেতে হয়, সেই তার প্রথম কারাবাস এবং বামপন্থী রাজনীতির জন্যে ১৯৪৮ সালে।

মুনীর চৌধুরী উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর পুত্র, তাঁর পিতা মরহুম হালিম চৌধুরী সে কালেই জেলা প্রশাসক ছিলেন, আলীগড়ের ছাত্র মুনীর চৌধুরী ছুটিতে বাড়ী এলেও আলীগড়ী চালচলন বজায় থাকত। শেরওয়ানি পাজামা শোভিত, হাতে দামী বিলাতি সিগারেটের টিন, বাবার সরকারী জিপ চালিয়ে বেড়াতেন। চলা বলা হাবভাবের মধ্যে আলীগড়ের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ একটা কৃত্রিম নবাবী চালচলন। অথচ সে মুনীর চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়ে বামপন্থী রাজনীতি আর প্রগতি সাহিত্য সংসদে ঝুঁকে পড়লেন। পোশাক পরিচ্ছদে বাঙালী হয়ে গেলেন, সাইকেল হল নিত্য সাথী। তখন পার্টি অফিস ছিল কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটে, প্রতিদিন হাতিরপুল 'দারুল আফিয়া' থেকে বা সলিমুল্লাহ

মুসলিম হল থেকে কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটে সাইকেলেই যাতায়াত চলত। মাঝে মাঝে তাঁকে দেখা যেত পথ সভায় চোঙ্গা ফুঁকতে। এর মধ্যে একটা নাটকীয় বৈশিষ্ট্য আছে বৈকি। তবে রাত্রিগুলো তিনি অতিবাহিত করতেন অধ্যয়নে, কিন্তু পাঠ্য পুস্তকে নয়, বিদেশী সাহিত্য পাঠে।

বামপন্থী রাজনীতি মুনীর চৌধুরীর ধাতে সহ্য হয়নি অর্থাৎ ঐ রাজনীতির কণ্টকাকীর্ণ পথে তিনি বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেননি। ঐ রাজনীতি তিনি যতদিন করেছেন ততদিন ভীষণভাবে করেছেন। চট্টগ্রামে এবং সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলে সে কারণে মুনীর চৌধুরী গোঁড়া দক্ষিণ পন্থীদের হাতে প্রহৃত হন। মুসলিম হলে সেদিন তার সঙ্গে আরও লাঞ্চিত হয়েছিলেন এ.কে. এম. আহ্সান যিনি পরে উচ্চপদস্থ সরকারী আমলা হয়েছিলেন। সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বামপন্থী রাজনীতিতে মুনীর চৌধুরীর সতীর্থ ছিলেন আখলাকুর রহমান, সরদার ফজলুল করীম এবং মুনীর চৌধুরীর ছোট বোন নাদিরা চৌধুরী। লক্ষণীয় যে আখলাকুর রহমান বা সরদার ফজলুল করীমও রাজনীতির ঐ পথ থেকে ফিরে এসেছিলেন। কেউ আগে কেউ পরে অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ কারণে আমরা মুনীর চৌধুরীকে পরবর্তী কালে যতটা অভিযুক্ত করেছি অন্যদের ততটা করিনি। বস্তুতঃ পক্ষে রাজনীতি মুনীর চৌধুরীর জন্যে ছিলনা, সে যে রাজনীতিই হোক না কেন। সে কারণেই সে দিন রাজনীতিক অপেক্ষা সাহিত্যিক হিসাবেই তিনি অধিকতর আদৃত হয়েছিলেন।

সে কালে ঢাকায় প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের পুরোধায় ছিলেন রনেশ দাসগুপ্ত, সত্যেন সেন, অচ্যুত গোস্বামী এবং অজিত কুমার গুহ। ওরা সবাই, বিশেষতঃ প্রথম তিনজন বিশেষ এক সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী, যে দৃষ্টিতে সাহিত্য হচ্ছে রাজনীতি ও অর্থনীতির অধীন। মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী ঐ বিশেষ চেতনায় কতটা প্রভাবিত হয়েছিল বলা শক্ত কারণ পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্য জিজ্ঞাসা সর্বদা রাজনীতি বা অর্থনীতির বশ্যতা স্বীকার করে চলেনি। তবে এটা ঠিক যে মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যিক জীবনের শুরুতে রনেশ দাসগুপ্ত, সত্যেনসেন এবং অচ্যুত গোস্বামী তাকে বিশেষ প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। আমার আজও প্রগতি সাহিত্য সংসদের একটি সভার কথা মনে আছে, সভাটা সম্ভবতঃ নবাবপুরে হয়েছিল, রথখোলার মোড়ে যে সাধনা ঔষধালয় আছে তার ওপরের তলায়। মুনীর চৌধুরী সেদিনকার সভায় একটা লেখা পড়েছিলেন, লেখাটি নানা কারণে অভিনব ছিল, প্রথমতঃ তা তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় লেখা, দুর্ভিক্ষে শুধু অন্নের অভাবে মানুষ কুকুর বেড়ালের মতো মরেনি, বস্ত্রের অভাবে লজ্জা নিবারণ করতে না পারায় মনুষ্যত্বেরও চরম অবমাননা

হচ্ছিল। লেখাটিতে এই অবস্থাটা চমৎকারভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। আমরা জানি যে মুনীর চৌধুরীর দেশ নোয়াখালি জেলায়, কিন্তু সম্ভবতঃ নোয়াখালিতে কখনও তিনি থাকেন নি, পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি নোয়াখালির উপভাষা স্বাভাবিকভাবেই শিখেছিলেন। ঐ লেখাটিতে নোয়াখালির উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল সুন্দর ভাবে। প্রগতি সাহিত্য সংসদের সেদিনের সভায় মুনীর চৌধুরী লেখাটি পড়লেন, আমরা সবাই মুগ্ধ। এবার সমালোচনার পালা, আমরা সবাই সমালোচকের কাছ থেকে রচনাটির প্রশংসা শোনবার জন্যে উদগ্রীব এবং মুনীর চৌধুরীও আশা করছিলেন যে তার লেখাটি প্রশংসিত হবে। কিন্তু সমালোচক রনেশ দাসগুপ্ত আমাদের বিমুখ করলেন। তিনি লেখাটির পুংখানুপুংখ সমালোচনার অবতারণা করে বললেন যে, এ রচনায় দুর্ভিক্ষের কারণে, বস্ত্রের অভাবে ন্যাংটো যে মানুষ গুলো, দিনের বেলায় আত্মগোপন করে থাকে, রাতের অন্ধকারে আব্রু রক্ষা করে বেরিয়ে আসে, সেই হতভাগ্যদের প্রতি সহানুভূতির সঙ্গে যেন কেমন একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুক, ব্যঙ্গদৃষ্টি জড়িত রয়েছে। মনে হয় যেন লেখক ন্যাংটোর দেশের মানুষগুলোর ঐ অবস্থাটা উপভোগ করছেন। বস্তুতঃ এ সমালোচনা অহেতুক ছিল না। শুধু লেখার মধ্যে নয়, শুধু কথা বার্তায় নয়, মুনীর চৌধুরীর সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীটাই ছিল কৌতুক এবং ব্যঙ্গপরিহাসময়। যারা মুনীর চৌধুরীকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন তারা তার ঐ বৈশিষ্ট্যটুকু বিশেষভাবে পছন্দ করতেন।

সাহিত্যিক মুনীর চৌধুরীর কাছে রাজনীতিক মুনীর চৌধুরী সেদিন পরাভূত হয়েছিল, রাজনীতি তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করেই পরিত্যাগ করেছিলেন, পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন অধ্যাপনাকে। অধ্যাপনার পেশা সেদিন তিনি গ্রহণ না করতেও পারতেন। সেদিনকার বামপন্থী এ. কে. এম. আহ্সান বা দক্ষিণ-পন্থী শফিউল আজমের মতো সরকারী পরীক্ষা দিয়ে সি. এস. পি. বা পি. এফ. এস. ভুক্ত হতে পারতেন স্বচ্ছন্দে। তাহলে সেদিন থেকে বিশ বছরের মধ্যেই তিনি চীফ সেক্রেটারী বা রাষ্ট্রদূত হয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু সে পথে সেদিন তিনি যাননি। অর্থাৎ সেদিনকার উজ্জ্বল মেধাসম্পন্ন ভাল ছাত্রদের মতো সরকারী আমলা হতে তিনি পারেননি, তার রুচিতে তা বেধেছে। আমলা না হলেও আইনের উচচ শিক্ষা নিয়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন আইনজ্ঞ হবার সমস্ত উপাদান মুনীর চৌধুরীর মধ্যে ছিল, কিন্তু ব্যারিষ্টারও তিনি হননি। সুবিধাবাদী রাজনীতি করলেতো কথাই ছিলনা, সে কালেই তিনি মন্ত্রী হতে পারতেন। তাকে রাজনীতি থেকে ফেরানোর জন্য তদানিন্তন চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমেদ তাকে সরাসরি ফরেন সার্ভিস নিয়ে নেবার টোপ ফেলেছিলেন কিন্তু মুনীর চৌধুরী সে টোপ গেলেননি। তিনি কিছুই হলেন না, তিনি অধ্যাপক হলেন,

প্রথমে খুলনা দৌলতপুর কলেজে (১৯৪৯-৫০) এবং পরে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে (১৯৫০)। তিনি দৌলতপুর কলেজে ইংরেজি ও বাংলার এবং জগন্নাথ কলেজে ইংরেজীর শিক্ষকতা করেন। সেদিনকার মুনীর চৌধুরীর এ পরিণতি অনেককে হতবাক করেছিল। সেদিনের রোমাণ্টিক নায়ক মুনীর চৌধুরী সাধারণ কলেজের সামান্য লেকচারারের পদ নিয়ে কি করে তৃপ্ত হলেন? সে কি নীড় বাঁধার জন্যে? লিলি মীর্জার সঙ্গে ইতিমধ্যেই তিনি পরিবারের অসম্মতি সত্ত্বেও বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, হয়তো সে কারণেই, হয়তো রাজনীতি থেকে দূরে সরে যাবার জন্যেই। তবে একটা আকাংখা ছিল মুনীর চৌধুরীর, নাটক রচনা এবং নাটক করা, তিনি প্রায়ই বলতেন সুবিধা থাকলে নাটককেই তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করতেন কিন্তু এ দেশে তা ছিলনা তাই হয়তো নাটক পড়াবার জন্যেই সাহিত্যের অধ্যাপনাকে তিনি বেছে নিলেন পেশা হিসেবে।

ছোট গল্প লিখে সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করলেও মুনীর চৌধুরী অচিরেই নাটকে নিবিষ্ট হলেন, ছাত্রজীবনে ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়নের সময়েই তিনি বিশেষভাবে নাট্যরসিক হয়ে ওঠেন। সাহিত্যের এ বিশেষ আঙ্গিকের প্রতি মুনীর চৌধুরীর আকর্ষণের মূল শেক্সপীয়ারের অমর সৃষ্টির মধ্যে নিহিত। ছাত্র জীবন থেকে শুরু করে জীবনের শেষ পর্যন্ত শেক্সপীয়ার ছিল তার নিত্য সাথী, শেক্সপীয়ারের নাটক অনবরত পাঠ ও তার নব নব ব্যাখ্যায় তিনি অক্লান্ত ছিলেন। শেক্সপীয়ারের প্রতিটি নাটকের একাধিক সংস্করণ সংগ্রহ করা ছিল তার একটি বাতিক। যে দেশেই তিনি গেছেন শেক্সপীয়ারের কোন না কোন নাটকের নতুন বা পুরাতন কোন না কোন সংস্করণ তিনি সংগ্রহ করতেনই। বিদেশে যখন যে শহরে যেতেন সব ছেড়ে ছুটতেন স্থানীয় থিয়েটারগুলিতে প্রাণভরে নাটক দেখে নিতেন। এমন নাটুকে প্রাণ আমাদের সমাজে আর জন্মগ্রহণ করেছেন কিনা সন্দেহ।

মুনীর চৌধুরী নাটক রচনায় হাত পাকান ঢাকা বেতার কেন্দ্রে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্ত হলে, রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রে প্রচারের জন্যে নাটকের অভাব দেখা দেয়। ঢাকা বেতারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ অমুসলমান শিল্পী সাহিত্যিক দেশ ছেড়ে চলে যান, ঢাকা বেতারে তখন প্রায় অচলাবস্থা। কলকাতা থেকে কিছু মুসলমান শিল্পী সাহিত্যিক ঢাকা এসে, ঢাকার মুষ্টিমেয় লেখক শিল্পীদের সঙ্গে একযোগে ঢাকা বেতার কেন্দ্রটি চালু রাখেন। ঢাকা বেতারের নাটক বিভাগ তখন বস্তুতঃ, নাজির আহমেদের পরিচালনাধীন ছিল। নাজির আহমেদ নাটকের জন্যে মুনীর চৌধুরীর শরণাপন্ন হন। ঘরে বসে ঢাকা

বেতারের জন্যে নাটক লিখে দেবার মতো অবস্থা তখন মুনীর চৌধুরীর ছিলনা, তাই নাজির আহমেদ মুনীর চৌধুরীকে প্রায়ই ধরে নিয়ে যেতেন নাজিমুদ্দিন রোডের ঢাকা বেতার কেন্দ্রে। সেখানে গোস্ত, পরটা, চা, পান ইত্যাদি সহ মুনীর চৌধুরীকে বসিয়ে দেওয়া হত এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এক একটি বেতার নাটক সৃষ্টি হত। সে সব নাটক নামে, বেনামে, বিভিন্ন নামে রেডিও পাকিস্তান ঢাকার প্রথম যুগে প্রচার হত। এভাবেই নাজির আহমেদ সেদিন মুনীর চৌধুরীর সহায়তায় ঢাকা বেতারের নাটক বিভাগকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

মুনীর চৌধুরী ছাত্রজীবনে অভিনয়ও করতেন, তিনি মাটির ঘর, শেষরক্ষা, বিজয়া, রাজরাজরা, প্রভৃতি নাটকে ছাত্র জীবনে অভিনয় করেছিলেন। পরবর্তী-কালে তিনি অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে তার 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকেও অভিনয় করেন। 'ভিলেন' চরিত্র রূপায়নে তিনি অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দিতেন। মুনীর চৌধুরী রচিত ও পরিচালিত প্রথম নাটক আমি দেখেছিলাম 'পলাশী ব্যারাক'। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ঢাকা পূর্ব বাংলার রাজধানী হলে, কলকাতা থেকে আগত কেরানীদের স্থান সংকুলানের জন্যে পলাশী এবং নীলক্ষেত ব্যারাক স্থাপিত হল। সারি সারি বাঁশের লম্বা ব্যারাক, তার মধ্যে থাকতেন মেস করে হাজার হাজার কেরানী। পলাশী ব্যারাকে আবার কয়েকটি দোতলা ব্যারাক ছিল, এই দ্বিতল ব্যারাকগুলোর এক তলার ছাদ আর দোতলার মেঝে ছিল কাঠের পাটাতন। পাটাতনের কাঠগুলোর মধ্যেও কিছু কিছু ফাঁক ছিল, যার মধ্য দিয়ে ওপর থেকে পানি, ময়লা স্বচ্ছন্দে নীচের বাসিন্দাদের ওপরে, তাদের বিছানা পত্রে পড়ত। এই নিয়ে উভয় তলার বাসিন্দাদের মধ্যে চলত বিসম্বাদ। এই পরিস্থিতিতে কল্পিত 'পলাশী ব্যারাক' নাটিকা। নাজিমুদ্দীন-নুরুল আমিনের মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ছিল ঐ নাটিকার উদ্দেশ্য। তবে ব্যারাকবাসী কেরানীদের দুরবস্থার প্রতি সহানুভূতি অপেক্ষা দোতলা পলাশী ব্যারাকের ওপর-নীচের কেরানী কোন্দলের পরিস্থিতিটার কৌতুক-ময় দিকটাই প্রাধান্য পেয়েছিল জগন্নাথ কলেজে অভিনীত 'পলাশী ব্যারাকে'।

ঢাকা শহরে তখনও সৌখিন মঞ্চে সহ-অভিনয় প্রথা প্রচলিত হয়নি, ঢাকায় সে সময়ে সখের নাটক অভিনীত হত প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে এবং নবাবপুর রেল গেটের নিকটস্থ রেলওয়ে মঞ্চে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ-অভিনয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত হয় ১৯৫২ সালেরও পরে। কিন্তু ঢাকায় ১৯৫০ সালে ডক্টরস ক্লাবের উদ্যোগে রেলওয়ে মঞ্চে 'বিজয়া' নাটকে সহ-অভিনয় চালু হয়। এ নাটকে মুনীর চৌধুরী অভিনয় করেছিলেন। এ নাটকে আরও ছিলেন ডাঃ শাকুর, মিসেস নূরজাহান মোর্শেদ, ডাঃ মেহেরুন্নেসা, রাজিয়া খান প্রমুখ। মুনীর

চৌধুরী যে অভিনয় করতেন তা ততটা অভিনয়ের নেশার জন্যে নয় বরং নাট্য আন্দোলনের জন্যে। বস্তুতঃ প্রথম থেকেই ঢাকার নাট্য আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন মুনীর চৌধুরী। ১৯৫১ সালে রেলওয়ে মঞ্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদের 'জবানবন্দী' নাটকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথম সহ-অভিনয়ে অংশ নেন। এ নাটকটির পরিচালনা করেন মুনীর চৌধুরী। নাটকের রিহার্সেল হত মুনীর চৌধুরীর নীলক্ষেতের বিশ্ববিদ্যালয় আবাসে। উল্লেখযোগ্য যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্চে সহ-অভিনয় স্বীকৃত ছিলনা বলেই সংস্কৃতি সংসদকে রেলওয়ে মঞ্চে যেতে হয়েছিল। এ নাটকেই আমি প্রথম মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে মঞ্চে কাজ করার সুযোগ পাই, অবশ্য নেপথ্যে।

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ দেশ বিভাগের পর দু'জন বিদেশী শিক্ষাবিদের আন্তরিক চেষ্টায় সুষ্ঠুভাবে চলছিল, তারা হলেন মিস্ এ. জি. ষ্টক ও প্রফেসার টার্নার। মুনীর চৌধুরী এ দুজন শিক্ষকেরই স্নেহধন্য ছিলেন। বস্তুতঃ এই বিদেশীদের জন্যে মুনীর চৌধুরী তার বামপন্থী ঐতিহ্য ও জেল রেকর্ড সত্ত্বেও ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পেরেছিলেন। পরে মিস্ ষ্টক ও প্রফেসার টার্নার উভয়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেদিন মিস্ ষ্টকের মতো সার্থক শিক্ষাবিদের বা টার্নারের মতো মানব হিতৈষীর স্থান হয়নি হয়েছিল নিউম্যানের মতো নাৎসী অনুচরের, যিনি বিদেশী হয়েও এ দেশের রাজনীতিতে এমন কি ছাত্র রাজনীতিতেও প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করতেন। নিউম্যান সাহেবের কিছু কিছু শিষ্যকে পরবর্তীকালে 'কনভেনশান মুসলিম লীগ' ও 'শান্তি কমিটির' নেতা রূপে দেখা গিয়েছিল। নিউম্যান সাহেবকেও অবশ্য পরে এ দেশ ছেড়ে বর্ণবাদী দক্ষিণ আফ্রিকায় আশ্রয় নিতে হয়। টার্নার সাহেবকে তাড়িয়ে পরে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যক্ষ হন। সৌভাগ্যক্রমে মুনীর চৌধুরী তার আগেই ইংরেজি বিভাগ ত্যাগ করে বাংলা বিভাগে যোগদান করেছিলেন।

মুনীর চৌধুরী ইংরেজি বিভাগে ১৯৫০ থেকে ৫২ সাল এই দুই বৎসর শিক্ষকতা করেছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা তিনি কতটা উপভোগ করতেন জানিনা তবে পরবর্তীকালে তাকে বলতে শুনেছি যে, আমাদের দেশে ইংরেজি সাহিত্য পড়ানো মানেই হল ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের শব্দের অর্থ বলে দেওয়া, এর অতিরিক্ত কিছু নয়, তিনি আরও বলতেন যে ঐ সব শব্দার্থ সম্বলিত পাঠ শিক্ষককে পরিশ্রম করে প্রস্তুত করতে হয় না কারণ ইংরেজির সুসম্পাদিত

পাঠ্যপুস্তকসমূহে শব্দার্থ, ব্যাখ্যা, টিকা, টিপ্পনি সবই যথারীতি সন্নিবেশিত থাকে। তবে শিক্ষককে যথার্থ পুস্তকটি লাইব্রেরী থেকে খুঁজে নিতে হয়। তিনি পরিহাস ছলে এমনও বলতেন যে, ইংরেজি সাহিত্যের একজন কৃতী অধ্যাপক ক্লাসে পাঠ্য কোন গ্রন্থের যে বিশেষ সংস্করণটি ব্যবহার করেন সেটি ছাড়া আর সব গ্রন্থের রেফারেন্সই ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে থাকেন। আমাদের দেশে ইংরেজি সাহিত্যের পঠন পাঠন সম্পর্ক মুনীর চৌধুরীর ঐ মন্তব্য বাস্তব অবস্থার সঙ্গে কতটা সম্পর্কিত বা এর কতটা কৌতুকছলে বর্ণিত তা আমি জানিনা। তবে তিনি কখনও এমন কথা বলেননি যে তিনি ইংরেজি সাহিত্য পড়াতে ভালবাসতেন না। নাটক পড়াতে তিনি নিশ্চয়ই খুব উপভোগ করতেন। আর পরবর্তীকালে বাংলা বিভাগে শিক্ষকতার সময়েও তাকে আমরা সর্বদাই কোন না কোন ইংরেজি গ্রন্থ পাঠ করতে দেখেছি, আর তার অধিকাংশই থাকতো নাটক। শুধু বার্নার্ড শ বা শেক্সপিয়ার নয়, আধুনিক এমনকি অতি সম্প্রতি প্রকাশিত ইংরেজি নাটকসমূহ তিনি নিয়মিত সংগ্রহ করতেন এবং গভীর মনযোগের সঙ্গে তা পাঠ করে ফেলতেন। এমন কি আফ্রিকার নিগ্রো-নাট্যকারদের ইংরেজি নাটক থেকেও তাকে প্রচুর আনন্দ পেতে দেখেছি।

১৯৫২ সালে পুনরায় কারাবরণের সময় মুনীর চৌধুরী ইংরেজি বিভাগেরই অধ্যাপক ছিলেন, আটচল্লিশ সালে শুরু হওয়া রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন আর মুসলিম লীগ সরকার বিরোধী বিক্ষোভ তখন বেশ তীব্রতালাভ করেছে। '৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সমস্ত দেশ প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও এর প্রতিবাদ জানানোর জন্যে একটি সভার আয়োজন করেছিলেন। শিক্ষকদের এই প্রতিবাদ সভা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়নি। এই সভা ডাকতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। সেকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক দের সভা ডেকে মুসলিম লীগ সরকারের সমালোচনা করা এক কঠিন ব্যাপার ছিল। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন মুসলিম লীগের লোক। সেকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে পাকি-স্তানের শিক্ষা সচিব ফজলুর রহমানের চেলাদের দাপট ছিল খুবই বেশী সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে সেখানে মুসলিম লীগের সমালোচনাসভা ডাকা ছিল কত বিপজ্জনক। শিক্ষকদের ঐতিহাসিক প্রতিবাদ সভায় জড় করার কঠিন দায়িত্ব সেদিন যে দুই একজন শিক্ষক পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন মুনীর চৌধুরী, আরও ছিলেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী। শিক্ষকদের ঐ প্রতিবাদ সভায় তারা বক্তৃতা করেন এবং অনেক কষ্টে একুশে ফেব্রুয়ারীর হত্যাকাণ্ডের সমালোচনা করে একটি প্রস্তাব ঐ সভায় পাশ করান।

সভায় উপস্থিত নুরুল আমিনের অনুচরেরা অবিলম্বে বিষয়টি সরকারের গোচরীভূত করেন। ফল স্বরূপ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী ও অধ্যাপক পৃথ্বীশ চক্রবর্তী গ্রেফতার হন। ঢাকা জগন্নাথ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক অজিতকুমার গুহও একই সময়ে গ্রেফতার হয়েছিলেন। ঐ সময়ে বন্দী হয়ে বহু রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী জেলে ছিলেন যেমন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, আবুল হাশিম, মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন প্রভৃতি। মুনীর চৌধুরীর আড়াই বৎসর জেল জীবন ঢাকা, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলে অতিবাহিত হয়। এই জেল জীবনেই তিনি শেখ মুজিবর রহমান, আবুল হাশিম, অজিতকুমার গুহর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। জীবনের শেষ পর্যন্ত এদের স্থান তার হৃদয়ের খুব কাছে ছিল, মুনীর চৌধুরীর প্রতিও তারা ছিলেন বরাবর আন্তরিক। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিমলীগ সরকারের পতনের পর মুনীর চৌধুরী জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন।

মুনীর চৌধুরীর এবারের বন্দী-দশা তার জীবনে এনে দেয় এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন। বন্দী জীবনের পুরো সময়টার তিনি সদব্যবহার করেন। জেলে প্রথম শ্রেণীর কয়েদিরূপে তিনি কেবলমাত্র বাগান বা রান্না করে সময় কাটাননি বরং এই সময়টায় তিনি বাংলা সাহিত্য গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেন। এ ব্যাপারে তাকে সর্বদা উৎসাহ আর প্রেরণা দিয়েছিলেন অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ। জেল থেকে তিনি বাংলাভাষা ও সাহিত্য এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে উভয় পর্বে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্য পাঠের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে যথার্থভাবে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, নিজের ভবিষ্যৎ জীবনকেও তিনি ঐ সূত্রে গ্রথিত করে নিয়েছিলেন। শুধু পাঠ নয়, পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি নয় এ সময়ে তিনি কিছু উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্মও করেন যেমন বার্ণাডশ'এর 'ইউ নেভার কেন টেল'-এর বঙ্গানুবাদ 'কেউ কিছু বলতে পারেনা'। 'কবর' নাটকও এই সময়েই রচিত, যে মহৎ সৃষ্টির জন্যে হয়তো তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

শুনেছি মহৎ স্রষ্টা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হন, মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকে কি তার নিজের এবং মাতৃভূমির ভবিষ্যতের ইঙ্গিত ছিলনা? 'কবর' নাটক রচনার মাত্র বিশ বছরের মধ্যেই কি ঘটে গেল এ দেশে আর তার নিজের জীবনে? স্মরণ করুন 'কবর' নাটকের সে দৃশ্যের কথা, যেখানে নেতা তার অনুচরকে বলছে লাশগুলোকে তিনি হাজার হাজার হাত মাটির নীচে সব পুঁতে ফেলবেন, যাতে কোন দিন আর ওগুলো উঠে আসতে না পারে, যাতে লাশ-গুলোর কোন চিহ্ন বা কোন লেশ না থাকে। বায়ান্ন সালের 'কবর' নাটকের

ঐ দৃশ্য কি একাত্তর সালে সত্য হয়ে উঠলনা, যেখানে পাকিস্তানী নর পশুরা অগণিত গণসমাধিতে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর মৃতদেহকে পুঁতে ফেলল। যে সব গণসমাধি থেকে বহুদিন অবধি হাজার হাজার নর কংকাল বেরিয়ে আসছিল। আর 'কবরে'র রচয়িতাও হয়তো স্থান পেয়েছিলেন অমনি এক গণসমাধিতে, যার কথা তিনি 'কবর' নাটকে লিখে গেছেন কত আগে! তিনি কি 'কবর' রচনার সময় নিজের অজান্তে আপন নিয়তিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন! 'কবর' নাটকের সে দৃশ্যের কথাও স্মরণ করুন যেখানে লাশগুলো জীবন্ত হয়ে কবর থেকে উঠে আসছে আর বলছে 'মিছে কথা মা। আমরা কেউ মরতে চাইনি মা। আমি বাঁচবো মা। আমি কিছুতেই মরবনা।' একাত্তর সালের ১৪ই ডিসেম্বরে পাকিস্তানী নরপশুরা আর তাদের অনুচর বদর বাহিনীর পিশাচেরা যে আমাদের শত শত বুদ্ধিজীবী ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে, পাশবিক ভাবে হত্যা করল। হত্যার আগে কারও চোখ উপড়ে নিল, কারও হৃদয়পিন্ড উৎপাটিত করল, কারও মাথা থেকে মগজ বের করে নিয়ে শিরচ্ছেদ করল, তারাওতো কেউ মরতে চায়নি, তারাও তো বাঁচতে চেয়েছিল, তারাওতো অসীম আকুলতায় স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করছিল। মুনীর চৌধুরীও মরতে চাননি, তিনিও বাঁচতে চেয়েছিলেন, স্বাধীন দেশে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে চেয়েছিলেন, সে কথাইতো তিনি 'কবর' নাটকে লিখে গেছেন।

মুনীর চৌধুরী জেল থেকে ১৯৫৪ সালে বাংলায় এম.এ. পরীক্ষা দিয়েছিলেন একই সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব, পরীক্ষার লিখিত অংশ জেলের ভেতরেই সম্পন্ন হয়েছিল তবে মৌখিক পরীক্ষার জন্যে তাঁকে পুলিশ প্রহরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। আমার এখনও সে দিনটির কথা মনে আছে যেদিন সকাল দশটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কলাভবনে মুনীর চৌধুরীকে পরীক্ষার জন্যে নিয়ে আসা হল। ১৯৫৪ সালে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে মুনীর চৌধুরীর নাম কিংবদন্তির মতো সবার মুখে মুখে। আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের পটভূমিকায় রাজবন্দীদের বিশেষতঃ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী ও অধ্যাপক অজিতকুমার গুহের মুক্তি দাবীতে পূর্ববাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত। এম.এর মৌখিক পরীক্ষা নিচ্ছিলেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক এবং অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই। সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে সঙ্গে এই পরীক্ষক মণ্ডলী এই বিশেষ পরীক্ষার্থীটির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সেদিন বাংলা বিভাগের এই পরীক্ষকমণ্ডলী যে অপরিসীম আগ্রহের সঙ্গে এই পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বাংলা বিভাগের ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই।

সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় সেদিন ভেঙ্গে পড়েছিল মুনীর চৌধুরীকে দেখবার জন্যে। সেদিন মুনীর চৌধুরীর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিতি সবার কাছে ছিল যেমন আকস্মিক তেমনি চমকপ্রদ, হঠাৎ যেন রূপকথার এক নায়ক অপর কোন লোক থেকে কিছুক্ষণের জন্যে উদয় হয়ে সবার মন জয় করে আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে ফজলুল হক, ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয় ও সরকার গঠনের পর অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও অন্যান্য রাজবন্দীরা মুক্তি লাভ করেন। অধ্যাপক চৌধুরী জেল থেকে বেরিয়ে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালে কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক সাহিত্য সম্মেলনে আমরা মুনীর চৌধুরীকে যোগদান করতে দেখি, ঐ সম্মেলনে তিনি অনুবাদ শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন। ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ব্যাপক রদবদল হয়, বিভাগীয় অধ্যক্ষ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দ্বিতীয় বার অবসর গ্রহণ করেন, অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করে পশ্চিম পাকিস্তান চলে যান। অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মনোনীত হন। হাই সাহেব বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেই বাংলা বিভাগ পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন। ডঃ জেংকিন্স তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার এবং অধ্যাপক টার্নার ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ। হাই সাহেবের ঐকান্তিক চেষ্টায় অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ইংরেজী বিভাগ ছেড়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। সে ১৯৫৫ সালের কথা, আমি তখন এম. এ. শেষ পর্বের ছাত্র, কবি হাসান হাফিজুর রহমানও একই ক্লাসে ছিলেন। ডঃ আনিসুজ্জামান তখন তৃতীয় বর্ষ অনার্সের ছাত্র। সৈয়দ আলী আহসান আমাদের পূর্বে মধুসূদন পড়াতেন, মুনীর চৌধুরী বিভাগে যোগদান করেই মধুসূদন এবং বঙ্কিম পড়াতে শুরু করেন। মুনীর চৌধুরীর প্রথম ক্লাসটি আমরা খুব মনযোগের সঙ্গে করলাম, সেদিন তিনি মাইকেল পড়িয়েছিলেন, খুব ভাল পড়ালেন তিনি, আমরা অবশ্য মুগ্ধ হয়েছিলাম মুনীর চৌধুরীর কাছে বঙ্কিম পড়ে। পরে বুঝেছিলাম যে কবিতার চেয়ে গদ্য বিশেষতঃ উপন্যাস মুনীর চৌধুরীর বিশেষ প্রিয় আর তার চেয়েও প্রিয় নাটক। কিন্তু বঙ্কিমের উপন্যাস পড়াতে গিয়ে মুনীর চৌধুরীর মধ্যে যে উল্লাস যে দক্ষতা লক্ষ্য করেছি তার কোন তুলনা নেই। বঙ্কিমের উপন্যাস ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে জীবন সত্যকে তিনি যে ভাবে তুলে ধরতেন হয়ত অন্য কারো রচনা থেকে তা করা সম্ভব ছিলনা। বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে ক্লাস কক্ষের মধ্যে মুনীর চৌধুরীর যে নৈপুন্য তার ছাত্র-ছাত্রীরা প্রত্যক্ষ করেছেন আমাদের দেশে তেমনটি

আর কখনও হবে কিনা জানিনা। তবে এটা ঠিক যে ক্লাস কক্ষে সাহিত্যের এবং সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জীবনের যে ব্যাখ্যা মুনীর চৌধুরী দিতেন তার যথার্থ রস গ্রহণের ক্ষমতা ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকের মধ্যেই ছিলনা। তিনি ক্লাসে কথা বলতেন অত্যন্ত দ্রুত, ঝড়ের মত, ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীরা অবাক বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে তার কথা শুনত, অভিভূত হয়ে ক্লাস করত, কিন্তু অধ্যাপক চৌধুরীর নব নব বিশ্লেষণ থেকে, যে কোন বিষয় একটি নতুন দৃষ্টিতে দেখবার, বিচার করবার অসাধারণ ক্ষমতা থেকে তারা কতটা গ্রহণ করতে সক্ষম হত সে সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। অধ্যাপক চৌধুরী কেবল একজন ভাল বক্তাই ছিলেন না, ক্লাসকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবার ক্ষমতার অধিকারীই ছিলেন না, প্রতিটি ক্লাসের জন্যে তিনি অসম্ভব পরিশ্রম করতেন। তিনি যে আজ এত বৎসর ধরে বঙ্কিম পড়াচ্ছিলেন তবুও সেদিন পর্যন্ত দেখেছি বঙ্কিমের ক্লাসের আগে আবার তিনি বঙ্কিম ঝালাই করে নিচ্ছেন, আবার নতুন করে প্রস্তুত হচ্ছেন ক্লাসের জন্যে। পূর্বে আমরা যারা মুনীর চৌধুরীর সহকর্মী ছিলাম তারা কি মুনীর চৌধুরীর ঐ অভ্যাসটি কখনও অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি? আমরা মুনীর চৌধুরীর মত ভাল বক্তা হতে চেয়েছি, তার বলার ভঙ্গী অনুসরণ করতে চেয়েছি, কিন্তু তার মত পড়ুয়া, পরিশ্রমী শিক্ষক হবার চেষ্টা করিনি। সেদিন পর্যন্ত দেখেছি ক্লাস থাকলে আগের দিন গভীর রাত্রি পর্যন্ত তিনি ক্লাসের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে শত কাজের মধ্যেও ক্লাসে যাবার আগের মুহূর্তটি পর্যন্ত পাঠ্য বিষয়টি বার বার ঝালিয়ে নিচ্ছেন। অথচ পাঠ্য বিষয়ে তাঁর যে জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য ছিল, যে কোন বিষয় সম্পর্কে বলবার তার যে ক্ষমতা ছিল এবং বিভিন্ন ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান অর্জনে যতটুকু আগ্রহ ছিল বা জ্ঞান আহরণে যে ক্ষমতা ছিল তাতে মুনীর চৌধুরী কোন প্রকার পরিশ্রম ছাড়াও জনপ্রিয় শিক্ষক হয়ে থাকতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা কোনদিন করেননি, তিনি ছাত্রদের কখনও ফাঁকি দেননি, প্রতারিত করেননি শিক্ষক সত্তাকে। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের কথায় ভোলাবার চেষ্টা করেননি, ভঙ্গী দিয়ে প্রতারিত করতে চাননি। মুনীর চৌধুরীর বিভিন্ন পরিচয়ের মধ্যে শিক্ষক পরিচয়ই সে কারণে আসল পরিচয় এবং শিক্ষক হিসেবে মুনীর চৌধুরীর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ততদিন উদ্‌ঘাটিত হয়নি যতদিন তিনি বাংলা বিভাগে শিক্ষকতা না করেছেন। বস্তুতঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকরূপেই মুনীর চৌধুরীর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছিল এর মধ্যেই তার বাগ্মীতা, ভাষাজ্ঞান, সাহিত্যবোধ, পাণ্ডিত্য আর বিশ্লেষণ ক্ষমতার যথার্থ সমন্বয় ঘটেছিল। শিক্ষকতা মুনীর চৌধুরী ভীষণভাবে উপভোগ করতেন। আমাদের চরম দুর্ভাগ্য যে স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্ররা মুনীর চৌধুরীর মত শিক্ষক থেকে বঞ্চিত হলেন।

অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই বিদেশ থেকে ধ্বনিতত্ত্বে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে দেশে ফিরে এসে আমাদের নতুনভাবে ধ্বনিতত্ত্ব পড়াতে শুরু করেন। তখন থেকে বাংলা বিভাগে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব চর্চাও নতুন প্রাণ পায়। মুনীর চৌধুরীও অধ্যাপক আবদুল হাই কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে এই শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৫৬ সালে তিনি ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী এর কিছুকাল পূর্বে জগন্নাথ কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী বিদেশে চলে গেলে প্রথমে ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম এবং পরে আমি বিভাগে শিক্ষকরূপে যোগদান করি। একই সময়ে অধ্যাপক অজিতকুমার গুহও কিছু কাল বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছিলেন।

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর আধুনিক ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন আমাদের ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল অন্যথা ঐ শাস্ত্রের বিস্ময়কর প্রসার এবং আধুনিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞান থেকে যেতাম। আধুনিক ভাষাতত্ত্বের তত্ত্বগত ও পদ্ধতিগত জটিলতাকে যেরূপ দক্ষতার সঙ্গে মুনীর চৌধুরী আয়ত্ব করেছিলেন তা ঐ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞদের যথার্থভাবে বোঝান যাবেনা। কেবলমাত্র তত্ত্বগত বা পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া আয়ত্ত্ব করা নয় তা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বাংলাভাষা বিশ্লেষণের নৈপুন্যেও মুনীর চৌধুরী অপরিসীম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী এবং তাঁর শিক্ষক অধ্যাপক চার্লস ফার্গুসন যৌথভাবে বাংলা ধ্বনি সংগঠনের যে বিশ্লেষণ করেছিলেন সেটি ভাষা তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক গবেষণা পত্রিকা 'Language'এ প্রকাশিত হয়েছিল।

মুনীর চৌধুরী ১৯৫৮ সালে দেশে ফিরে আসেন এবং পুনরায় বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন, যেহেতু আমি মুনীর চৌধুরীর স্থানে চাকুরীতে বহাল ছিলাম সে কারণে মুনীর চৌধুরী প্রত্যাবর্তন করলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অস্থায়ী চাকুরীর অবসান ঘটে। আমি তখন বাংলা একাডেমীতে সহ-গবেষণাধ্যক্ষ রূপে যোগদান করি। ইতিমধ্যে দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয়েছে এবং জেনারেল আইয়ুব খান দোর্দণ্ডপ্রতাপে দেশ শাসন করছেন। আইয়ুব খান পাকিস্তানের দণ্ডমুণ্ডকর্তা হয়েই প্রস্তাব করে বসলেন যে পাকিস্তানে সব কটি ভাষার জন্যে রোমান হরফ প্রবর্তন করতে হবে। এই প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি হিসাবে তিনি পাকিস্তানের ঐক্য, সংহতি, বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ এবং বিজ্ঞানের দোহাই দিলেন। তিনি এমনও আভাস দিলেন যে বাংলা ও উর্দুকে

এক হরফে লিখতে পারলে ভবিষ্যতে পাকিস্তানের জন্যে একটি জাতীয় ভাষা সৃষ্টি করাও সম্ভব হবে। আইয়ুব খান এই প্রস্তাব করার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী আইয়ুব খানের এই প্রস্তাব সমর্থন করে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রচার করেন। সময়টা ১৯৫৯ সাল, তখন আইয়ুব খানের সামান্যতম বিরোধিতা করা কারও পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এ পরিস্থিতির মধ্যেও আমরা আলোচনা করে ঠিক করলাম যে উর্দু এবং বাংলা ভাষায় রোমান হরফ প্রবর্তনের সোপারেশ সম্পর্কে আলোচনার জন্যে একটি সভা আহ্বান করা হবে এবং 'একাডেমিক' আলোচনার ছদ্মাবরণে আইয়ুব খানের ঐ প্রস্তাবের অসারতা প্রতিপন্ন করা হবে। ইনষ্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্সে আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সভায় আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্যে আমরা চারজনের বেশী পণ্ডিতকে রাজী করাতে পারিনি। উর্দু সম্পর্কে ডঃ আন্দালিব শাদানী ও ডঃ হানিফ ফউখ এবং বাংলা সম্পর্কে অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই ও অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী এবং ডঃ শাদানী উভয়েই বিস্তারিত যুক্তি তর্কের সাহায্যে বাংলা ও উর্দু ভাষায় রোমান হরফ প্রবর্তনের বিরোধিতা করেন। ডঃ শাদানী অবশ্য পরে বেগতিক দেখে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রচার করে উর্দুর জন্যে রোমান হরফ প্রবর্তন সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীকে দিয়ে সরকার ঐ কাজটি করাতে পারেননি। একই সময়ে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী আর একটি দুঃসাহসী কাজ করেছিলেন, ১৯৪৯ সালের ৯ই মার্চ পূর্ব বঙ্গ সরকার বাংলাভাষা সংস্কারের জন্যে 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি' গঠন করে-ছিলেন, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান ছিলেন ঐ কমিটির সভাপতি। ১৯৫০ সালের ৭ই ডিসেম্বর 'পূর্ববাংলা ভাষা কমিটি' সরকারের কাছে তাদের রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে ঐ কমিটি বাংলাভাষার সংস্কার করে বাংলা ভাষা থেকে 'হিন্দুয়ানী' সব কিছু বাদ দিয়ে মুসলমানী বাংলা ভাষা নির্মাণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান সরকার আট বৎসর পর্যন্ত এই রিপোর্টটি প্রকাশ করেনি। আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসার পর ১৯৫৯ সালে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় এবং সোপারেশসমূহ কার্যে পরিণত করার চেষ্টা চলে। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক সাহেব তখন বাংলা একাডেমীর পরিচালক। সরকারী কর্মচারী হিসেবে ডঃ এনামুল হকের পক্ষে ঐ সংস্কার প্রয়াসের বিরোধিতা করা সম্ভবপর ছিলনা। আমি বাংলা একাডেমীর সহ-গবেষণাধ্যক্ষরূপে ডঃ হকের অনুমোদনক্রমে বাংলা একাডেমীর গবেষণাবিভাগের পক্ষ থেকে পূর্ব বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটির প্রস্তাবসমূহ বিবেচনার জন্যে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করি। আলোচনায় যোগদানের জন্যে এবারেও কেবলমাত্র অধ্যাপক মুনীর

চৌধুরীকেই রাজী করান গেল। তিনি ভাষা কমিটির রিপোর্টের কয়েক গুণ বড় কলেবরের একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন এবং পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটির সংস্কার প্রস্তাবসমূহের অসারতা প্রমাণ করলেন।

১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সাল এই দশ বৎসর অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর সহ-কর্মীরূপে তাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখার ও জানার সুযোগ আমার হয়। অধ্যাপক চৌধুরী ১৯৬২ সালে ৩৭ বৎসর বাংলা বিভাগের রীডার এবং ১৯৭০ সালে ৪৫ বৎসর বয়সে প্রফেসার পদে উন্নীত হন। ১৯৬১ সালে আমরা ঢাকায় রবীন্দ্র জন্ম শত বার্ষিকী উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করি, সঙ্গে সঙ্গে সরকার ও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের তরফ থেকে প্রবল বাধার সৃষ্টি করা হয়। আমরা বিচারপতি মাহবুব মোর্শেদকে সভাপতি ও অধ্যাপক খান সারওয়ার মোর্শেদকে সম্পাদক নির্বাচিত করে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করি। সারা বিশ্বে তখন রবীন্দ্র শত বার্ষিকী উদযাপনের প্রস্তুতি চলছিল অথচ বঙ্গ-ভাষাভাষী পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্র শত বার্ষিকী উদযাপনের আবেদন পত্র স্বাক্ষর করাতে গিয়ে বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকদের কাছ থেকে যে আচরণ পাওয়া গিয়ে-ছিল তা ছিল নিতান্তই হতাশাব্যঞ্জক। সেদিন যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী সরকারী বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে আমাদের আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন, প্রস্তুতি কমিটির সভ্য হয়েছিলেন এবং রবীন্দ্র শত বার্ষিকী অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের প্রথম সারিতে ছিলেন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী। রবীন্দ্র শত বার্ষিকী ছিল আমাদের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ, সে ছিল পাকিস্তানে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম। আমরা যথাযথভাবে সে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করেছিলাম।

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী রবীন্দ্র কবিতার ভক্ত ছিলেন না। সাধারণভাবেই তিনি ভাববাদী কবিতার প্রতি বিমুখ ছিলেন। বরং রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনা সমূহ তাকে অধিকতর আকৃষ্ট করত। কিন্তু যখনই রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী সংস্কৃতির-প্রতিভূরূপে আক্রমণের, আঘাতের সম্মুখীন হয়েছেন তখনই মুনীর চৌধুরী যেমন প্রবলভাবে রবীন্দ্রনাথের জন্যে সংগ্রাম করেছেন তা রবীন্দ্র সাহিত্যের অতি ভক্তদের জন্যেও শ্লাঘার বিষয় ছিল।

মাইকেলের নাটক এবং দীনবন্ধুর প্রহসন মুনীর চৌধুরীর খুব প্রিয় ছিল, ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ আয়োজিত ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহে নাটক থেকে পাঠের যে অনুষ্ঠান ছিল তাতে দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' প্রহসনটির তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কটুকু পাঠ করা হয়েছিল, এই পাঠে মুনীর চৌধুরী স্বয়ং নিমচাঁদের চরিত্র রূপায়িত করেন। নিমচাঁদের সে অনবদ্য রূপায়ণ

আজও আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। আমরা জানি নিমচাঁদ চরিত্রে মধুসূদনের ছায়াপাত ঘটেছিল আর আমার মনে হয় মাইকেলের চরিত্রের সঙ্গে মুনীর চৌধুরীর কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে। মাইকেলের মতই মুনীর চৌধুরী ইংরেজি সাহিত্যের বিশেষতঃ গ্রীক নাটকের ভক্ত ছিলেন। গ্রীক নাটকের নিয়তি যেমন রাবণ চরিত্রকে তেমনি মাইকেল জীবনের পরিণতিকে বিষাদান্ত করেছিল, মুনীর চৌধুরীর জীবনেও আমরা নিয়তির নিষ্ঠুর লীলা প্রত্যক্ষ করি। মুনীর চৌধুরী যেন একটি গ্রীক নাটকের নায়ক, নিয়তির অমোঘ বিধানে অনিবার্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী নাটকেও আমরা নিয়তির প্রাধান্য লক্ষ্য করি। কৃষ্ণকুমারী নাটক অভিনয় করাতে গিয়েও অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী বিপদে পড়েছিলেন। ১৯৬৪ সালের গোড়ার দিকে বাংলা একাডেমী আয়োজিত তৃতীয় নাট্য মওসুমে একাডেমী মঞ্চে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক নাট্য গোষ্ঠি থেকে কৃষ্ণকুমারী নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়। কৃষ্ণকুমারী নাটক বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি বিধায় বাংলা বিভাগের অনার্স শ্রেণীর পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল। ১৯৬৪ সালের শুরুতে যখন মুনীর চৌধুরীর প্রযোজনায় ও আমার পরিচালনায় কৃষ্ণকুমারী নাটক মঞ্চস্থ হয় তখন ঢাকায় গভর্ণর মোনায়েম খানের ইঙ্গিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারও সূত্রপাত হয়। কৃষ্ণকুমারী নাটকে 'যবন' শব্দটির ব্যবহার আছে তবে তা খারাপ অর্থে নয় বা মুসলমানদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে নয়। এ দেশে কারা প্রথম গোলাপ ফুল আনয়ন করে সে প্রসঙ্গে 'যবন' শব্দটি নাটকে ব্যবহৃত। নাটকটি মঞ্চস্থ করার সময়ে আমরা শব্দটির কোন পরিবর্তন করিনি। নাটক অভিনয়ের পর পরই সংবাদটি গভর্ণর মোনায়েম খানের কানে পৌঁছে দেওয়া হয়, তিনি কৃষ্ণকুমারী নাটকটি চেয়ে পাঠান এবং কে বা কারা এই নাটকটি মঞ্চস্থ করার জন্যে দায়ী তাও জানতে চান। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন ডঃ ওসমান গনি। যথাসময়ে কৃষ্ণকুমারী গ্রন্থটি এবং অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও আমার নাম গভর্নরের কাছে প্রেরিত হয়। সেদিন অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই আমাদের চাকুরী রক্ষা করেছিলেন কিন্তু কৃষ্ণকুমারী নাটকটি পাঠ্য তালিকা থেকে বাদ দিতে হয়েছিল।

১৯৬৭ সালে রবীন্দ্র বিতর্ক চরম আকার ধারণ করে আসে রবীন্দ্র সাহিত্য ও সংগীতের ওপর আঘাত। ঐ বৎসর জুন মাসে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে তথ্য মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন পাকিস্তানের আদর্শ বিরোধী এই অজুহাতে বেতার ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও রবীন্দ্র সাহিত্য নিষিদ্ধ করার কথা ঘোষণা করেন। দেশে এ সম্পর্কে প্রবল প্রতিক্রিয়া হলেও সে প্রতিক্রিয়াকে প্রতিবাদে

রূপান্তরের জন্যে কিছু বুদ্ধিজীবীর এগিয়ে আসবার প্রয়োজন ছিল। এ সম্পর্কে ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং আমি পরামর্শ করে স্থির করি যে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রচার করে সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাতে হবে। আমরা তিনজনে মিলে বিবৃতিটির একটি মোসাবেদা করি কিন্তু তা আমাদের মনোঃপুত না হওয়ায় আমরা মুনীর চৌধুরীর শরণাপন্ন হই। তিনি আমাদের বক্তব্য শুনে বিষয়টি অনুধাবন করে নেন এবং সঙ্গে সঙ্গে টাইপরাইটারে বসে সংক্ষেপে সুন্দর একটি প্রতিবাদ বিবৃতি তৈরী করে দেন। বিবৃতিটি ছিল এইরূপ, "স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় ২৩শে জুন ১৯৬৭ তারিখে মুদ্রিত একটি সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এতে সরকারী মাধ্যম হতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার হ্রাস ও বর্জনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলা ভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করেছে, তাঁর সঙ্গীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা দান করেছে, তা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। সরকারী নীতি নির্ধারণের সময় এই সত্যের গুরুত্বকে মর্যাদা দান করা অপরিহার্য।" মুনীর চৌধুরীই বিবৃতিটিতে প্রথম স্বাক্ষর দান করেন, এছাড়া স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে আরও ছিলেন ডঃ কুদরত-ই-খুদা, বেগম সুফিয়া কামাল, এম. এ. বারি, সিকানদার আবু জাফর, কবি শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান ও ফজল শাহাবুদ্দীন, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, ডঃ খান সারওয়ার মোর্শেদ, শিল্পী জয়নুল আবেদিন এবং সাংবাদিক-সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ্ কায়সার। বাংলা বিভাগের অধ্যাপকদের মধ্যে মুনীর চৌধুরী ছাড়াও স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই, ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম, ডঃ আহমদ শরিফ, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং রফিকুল ইসলাম। বিবৃতিটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে সব মহলেই তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিরোধী শক্তিসমূহ গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। গভর্নর মোনায়েম খান উপাচার্য ডঃ ওসমান গণিকে ঐ বিবৃতির উদ্যোক্তা বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দেন। ডঃ গনি যেদিন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীকে ঐ বিষয়ে আলোচনার জন্যে ডেকে পাঠান তখন আমি তার সঙ্গেই ছিলাম। ডঃ গনি ঐ বিবৃতিটির জন্যে গভর্নর মোনায়েম খানের তীব্র প্রতিক্রিয়ার বিবরণী দিয়ে বাংলা বিভাগের কৈফিয়ৎ শুনতে চান। সেদিন মুনীর চৌধুরী অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে ডঃ গনিকে বলেছিলেন, 'আমরা বাঙ্গালী, সর্বোপরী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক, এ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমাদের যে মতামত তাতে লুকাবার কিছু নেই,

আমরা আমাদের মতামত প্রকাশ করে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে আমাদের কর্তব্য করেছি মাত্র।" ডঃ ওসমান গনি সেদিন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর উত্তরে বেশ বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি মুনীর চৌধুরীর যুক্তি ব্যক্তিগত-ভাবে মেনে নিয়েছিলেন তবে উপাচার্য হিসেবে তার যে কর্তব্য রয়েছে সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেননি। পরবর্তীকালে অবশ্য দেশে রবীন্দ্র নাথের পক্ষে প্রবল জনমত সৃষ্টি হওয়ায় মোনায়েম খান বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করার সর-কারী এবং দক্ষিণপন্থী প্রয়াসও চরমভাবে পর্যুদস্ত হয়।

মুনীর চৌধুরী শুধু বাংলা ভাষা বা রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নেই নয় বাংলা হরফ সংস্কারের প্রশ্নেও আপোষ করেননি। ১৯৬৭-৬৮ সালের দিকে গভর্নর মোনায়েম খানের ইঙ্গিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ওসমান গনি বাংলা ভাষা ও বাংলা লিপি সংস্কারের জন্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন। বাংলা একাডেমীর তদানিন্তন পরিচালক ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ এই কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হন। ঐ কমিটি বাংলাভাষাকে সংস্কারের নামে পঙ্গু ও বিকৃত করার জন্যে একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করে। কমিটির তিনজন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই এবং ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক কমিটির মূল রিপোর্টের সঙ্গে ভিন্নমত প্রকাশ করে এবং বাংলা ভাষা ও হরফ সংস্কারের বিরোধিতা করে একটি ভিন্ন রিপোর্ট প্রদান করেন। কিন্তু ডঃ সাজ্জাদ হোসা-য়েনের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ঐ সংস্কার প্রস্তাব-সমূহ অনুমোদন করে এবং তা চালু করার নির্দেশ দান করে। একাডেমিক কাউন্সিলের ঐ সভায় কেবলমাত্র ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই এবং অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বাংলাভাষা সংস্কারের বিপক্ষে ভোট দেন। মুনীর চৌধুরী সাহেব একাডেমিক কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন না। একাডেমিক কাউন্সিলের অন্য সব সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের প্রধানরা এবং বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষেরা বাংলা ভাষাকে খর্ব করবার ষড়যন্ত্রের সমর্থন কারী ছিলেন। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলের ঐ সংস্কার প্রয়াসের বিরুদ্ধে একাই লেখনী ধারণ করেন। প্রথমে ঢাকার কোন দৈনিক পত্রিকাই তার ঐ সব লেখা প্রকাশ করতে রাজী হয়নি, পরে অনেক চেষ্টার পর পাকিস্তান ফিচার সিণ্ডিকেটের সৌজন্যে 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকায় একটি এবং 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকায় কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়। ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনের সময় পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ সংস্কার প্রয়াস অব্যাহত ছিল আর অধ্যাপক

মুনীর চৌদুরীও অসীম ধৈর্যের সঙ্গে এককভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ বাংলা ভাষা বিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ে যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঐ সংস্কার প্রচেষ্টা থেকে ক্ষান্ত না হওয়া পর্যন্ত মুনীর চৌধুরীর লেখনীও ক্ষান্ত হয়নি। বাংলা ভাষার ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে তার ঐ একক সংগ্রাম থেকে বাংলা ভাষার জন্যে মুনীর চৌধুরীর অনুভূতি যে কত গভীর কত ব্যাপক ছিল তার পরিচয় পাই, সেদিন সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে তিনি সাহসী সৈনিকের মত একা লড়েছিলেন, যেমন তিনি লড়েছিলেন বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্যে।

জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলাভাষা প্রচলনের কথা আমরা মুখে সবাই বলে থাকি কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই তা অন্তর থেকে চাইনা। আমাদের চরিত্রের এই স্ববিরোধিতা, এই দুর্বলতা অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীই প্রথম আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। অধ্যাপক চৌধুরী এ প্রসঙ্গে প্রায়ই বলতেন 'রক্ষণশীলতার শেষ দুর্গ হল বিশ্ববিদ্যালয়', তিনি আরও বলতেন 'এই দুর্গ ভাঙ্গতে না পারলে বাংলা ভাষার প্রচলন সম্ভবপর হবেনা', রক্ষণশীলতার এই দুর্গে মুনীর চৌধুরীই প্রথম আঘাত হেনেছিলেন। বাংলা বিভাগের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে বাংলা প্রচলনের জন্যে তিনি কেবল সর্বাধুনিক বাংলা টাইপ রাইটারের উদ্ভব করেই ক্ষান্ত হননি, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার বাহনরূপে বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্যে একাডেমিক কাউন্সিলে ক্রমাগত প্রস্তাবের পর প্রস্তাব উত্থাপন করেন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর অধ্যাপকদের অবিমৃষ্যকারিতা এবং হীনমন্যতার জন্যে তিনি বার বার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হন, কিন্তু তাতে তিনি কোনদিন হতোদ্যম হননি, সংগ্রামে ক্ষান্ত হননি। মুনীর চৌধুরীর বাংলা প্রচলন প্রয়াস কেন সফল হয়নি আজ স্বাধীন বাংলা দেশে বসে তা আমরা সম্যকভাবে অনুধাবন করতে পারছি। মুনীর চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের কায়েমী স্বার্থবাদীদের চরিত্রের স্বরূপ খুব ভালভাবেই জানতেন এবং তারাও মুনীর চৌধুরীকে তাদের এক নম্বর শত্রু বলেই জানত। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বন্দী শিবিরে আটক থাকার সময় জিজ্ঞাসাবাদের সময় টের পেয়েছিলাম যে পাকিস্তান সামরিক চক্রও বিশ্ববিদ্যালয়ে মুনীর চৌধুরীকেই এক নম্বর দুশমনরূপে জানত। বস্তুতঃ পাকিস্তানীরা এবং কায়েমী স্বার্থবাদীরা মুনীর চৌধুরীকে যথার্থই চিনতে পেরেছিল। এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য যে 'পূর্বদেশ' পত্রিকায় 'পূর্ব পাকিস্তান'কে 'বাংলা' নামকরণের প্রস্তাবের সমর্থনে যে কয়জন বুদ্ধিজীবী বিবৃতি প্রচার করেছিলেন তাদের মধ্যে পয়লা নম্বর ছিলেন মুনীর চৌধুরী।

বস্তুতঃ পাকিস্তান সামরিক চক্র ও কোন ভুল করেনি। বন্দী-শিবিরে জিজ্ঞাসা-

বাদের সময় আমাকে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আহসানুল হককে প্রধানতঃ মুনীর চৌধুরীর কার্যকলাপ সম্বন্ধেই প্রশ্ন করা হয়। আমাকে পীড়ন করে সামরিক চক্র এই স্বীকারোক্তি আদায় করতে চেয়েছিলেন যে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে অধ্যক্ষ মুনীর চৌধুরীর পরিচালনায় বাঙালী জাতিয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত করি, প্রেরণা যোগাই এবং নেতৃত্ব দান করি। এই স্বীকারোক্তি তারা আমার কাছ থেকে আদায় করতে পারেনি, শত নির্যাতনেও নয়। তবে এটা ঠিক যে সামরিক চক্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ সম্পর্কে যথার্থ ধারণাই করেছিল।

২৫শে মার্চের কাল রাত্রির পরে অনেকেই দেশ ছেড়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কোন শিক্ষকই দেশ ত্যাগ করেননি। যারা আত্মগোপন করেছিলেন তারাও দেশের মধ্যেই ছিলেন, যারা তা করতে পারেননি তারা পাকিস্তান সামরিক চক্রের বন্দী শিবিরে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ঐ সময়ে স্বদেশে অবস্থান বিপজ্জনক জেনেও দেশ ত্যাগ করেননি। অথচ সহজেই তিনি দেশ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে যেতে পারতেন, সেখানে তার সমাদর তার প্রতিভা গুণেই কারও চেয়ে কম হতনা। পশ্চিম বঙ্গ থেকে সহজেই তিনি বিদেশে চলে যেতে পারতেন। আগেও তিনি কয়েকবারই সংক্ষিপ্ত সফরে জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানীতে গিয়েছেন, ঐ সব দেশে অনেক শিক্ষাবিদ অধ্যাপক চৌধুরীর গুণগ্রাহী ছিলেন, তিনি ইচ্ছে করলেই যুক্তরাষ্ট্রের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসার হয়ে যেতে পারতেন এবং মুক্তি সংগ্রাম শেষে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে উচ্চ পদ লাভ করতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করলেন না, তিনি দেশে মাটি কামড়ে পড়ে রইলেন এবং আল বদরের শিকার হলেন।

বিগত নয় মাস কাল অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী যে নারকীয় জীবন যাপন করেন তার বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। বিভাগে তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে চার জন পদচ্যুত হন, তিনজন আত্মগোপন করে থাকেন, একজন ছিলেন বন্দী শিবিরে, অধ্যাপক চৌধুরী স্বয়ং এবং অপর একজন টিক্কা খানের সতর্কবাণী লাভ করেন। হাসান জামানের নেতৃত্বে একটি পাঠ্য পুস্তক সংস্কার কমিটি বার বার পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের জন্যে চাপ দিচ্ছিল। এ অবস্থায়ও বাংলা বিভাগের পাঠ্য সূচীতে কোন পরিবর্তন তিনি আনতে দেননি। রবীন্দ্র রচনাবলীর সেট বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের ঘর থেকে অপসারণ করেননি। পরিবারেও একই অবস্থা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃবধূ চট্টগ্রামে বন্দী শিবিরে আটক, পুত্র ওপারে। সবার ওপরে

অধ্যাপক চৌধুরীর মেরুদণ্ডের প্রচণ্ড বেদনা, প্রতিদিন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে রে-চিকিৎসা নিতে হত। ডঃ ফজলে রাব্বি তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা না করালে ভবিষ্যতে পঙ্গু হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু মুনীর চৌধুরী যেন সমস্ত প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলছিলেন, পরাধীন দেশে শৃংখলিত, জীবন্মৃত মানুষের মত তিনি জীবন যাপন করছিলেন আর দিন গুণছিলেন স্বাধীনতার চরম মুহূর্তটির জন্যে আকুল আগ্রহে। এ যেন 'শাজাহান' নাটকের বৃদ্ধ শাজাহান চরিত্র, আগ্রার দুর্গের অসহায় বন্দী। মুনীর চৌধুরী বন্দী হয়েছিলেন এক প্রতিকূল পরিবেশের, এক ভয়াবহ চক্রান্তের, নিয়তি তাকে দ্রুত অনিবার্য পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছিল অথচ তা প্রতিরোধের শক্তি তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

মুনীর চৌধুরী নাকি একবার বলেছিলেন যে তিনি জীবনের মোহের কাছে পরাজিত, আমি বলব জীবনের মোহের কাছে নয় তিনি পরাজিত হয়েছিলেন কর্তব্যবোধের কাছে, বিবেকের কাছে। সে কর্তব্যবোধ মাতার জন্যে, স্ত্রী-পুত্রের জন্যে, ভাই-বোনদের জন্যে, সহকর্মীদের জন্যে। যাদের পেছনে ফেলে অনায়াসে স্বার্থপরের মত নিজের নিরাপত্তা নিয়ে তিনি পালিয়ে যেতে পারলেন না, সবার প্রতি তিনি কর্তব্য করে গেলেন, করলেন না শুধু নিজের প্রতি। যন্ত্রণাক্লিষ্ট শরীরটার যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থাও তিনি করেননি, কষ্ট পেয়েছেন অসম্ভব এবং তা দীর্ঘদিন অথচ তা সহ্য করেছেন, কখনও সে যন্ত্রণার কথা তিনি প্রকাশ করেননি। যন্ত্রণায় তার দেহটা বেঁকে গিয়েছিল কিন্তু কোন জরা, ব্যাধি তার মস্তিষ্ককে স্পর্শ করতে পারেনি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যা সজীব এবং সজাগ ছিল। শেষ দিকে তিনি শেক্সপীয়রের একাধিক নাটক অনুবাদ কর্মের মধ্যে ডুবে থাকতেন, এবারে আর শুধু কমেডি নয় ট্র্যাজেডিতেও হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কি জানতেন ট্র্যাজেডি ঘনিয়ে আসছে তার নিজের জীবনে, তিনি কি জানতেন গ্রীক নাটকের সেই নিয়তি তাকে এক দুর্লংঘনীয় পরিণতির শেষ প্রান্তে টেনে এনেছে? আমি বন্দী শিবির থেকে বেরিয়েই মুনীর চৌধুরীকে সতর্ক করেছিলাম, তাকে বলেছিলাম যুদ্ধ শুরু হলেই অদৃশ্য হয়ে যেতে, কিন্তু তিনিতো কোথাও গেলেন না নিয়তিকেই মেনে নিলেন। মনে হয় মুনীর চৌধুরী এক ট্র্যাজেডির নায়ক। যে চরিত্রের মৃত্যু নেই, যে চরিত্র অমর, চিরঞ্জীব। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর সে চরিত্রের চলা শুরু হয়েছিল আর ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে মাত্র ছেচল্লিশ বৎসর বয়সে তা জোর করে চিরকালের জন্যে থামিয়ে দেওয়া হল। থেমে যাবার মাত্র কয়েকদিন আগে ন'মাস আত্মগোপনরত বিভাগের সর্বকনিষ্ঠ সহকর্মী

আকরম হোসেনকে একটি পত্র লিখছিলেন তিনি, পত্রটিও তার জীবনের মতই অসমাপ্ত—

তোমার উভয় পত্র হস্তগত। আশ্চর্য
এখনও প্রায় সবাই জীবিত অন্তত।
রফিক কিছুকাল আটক থেকে এখন
মুক্ত যাকে বলে। অন্য দুজন অনাসক্ত
উধাও ফেরার। আমার তো বটেই,
অন্য সবার মনেও তুমি আবেগোষ
স্পন্দিত উজ্জ্বল অম্লান। বেতারে ঘোষিত
যশোহর ধূমায়িত ম্রিয়মান। আবার
কি দেখব তোমাকে চোখের সামনে,
প্রাণে মেলাব প্রাণ? তোমার কথার
রত্নভাণ্ডার ভরে তুলবে আমার
রচনা সম্ভার? কখনও কি লিখব আবার?

সভাপতির ভাষণ

আবদুল কাদির

উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও সুধিবৃন্দ !

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ মুনীর চৌধুরী-মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী-আনোয়ার পাশা-বক্তৃতামালার অ য়োজন ক'রে এদেশের সাহিত্যসেবী ও সমাজ-কর্মীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। আমাদের পরম প্রিয় পরলোকগত প্রফেসর মুনীর চৌধুরীর জীবনবৃত্ত ও সাহিত্যনিষ্ঠার ব্যাখ্যান ক'রে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম আজ যে সুদীর্ঘ সন্দর্ভ পাঠ করলেন, তা শুনে মরহুমের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা —যাঁরা তাঁর জীবনকথা উত্তমরূপে অবগত আছেন—হয়ত ভাবছেন যে, এই ব্যাখ্যান তথ্য ও পরিবেশনার দিক দিয়ে অপ্রচুর। আর যাঁরা প্রফেসার মুনীর চৌধুরীকে ভালভাবে জানেন না, তাঁরা হয়ত ভাবছেন যে, আদর্শের প্রতি ও সাহিত্যসেবায় তাঁর এরূপ ঐকান্তিক ও নিরলস নিষ্ঠার কথা প্রথা-মাফিক অতিশয়োক্তি। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, পৃথিবীতে প্রতিভার অভ্যুদয় চির-দিনই এক বিস্ময়কর ব্যাপার ; তার প্রকৃতির উপলব্ধি ও প্রকৃত মূল্যায়ন সাধারণের পক্ষে সুকঠিন। সেই প্রতিভার বিকাশধারার সঙ্গে দেশবাসী যত বেশী হয় পরিচিত, তার স্থষ্টির রহস্য মানুষের সমক্ষে যত বেশী হয় উন্মোচিত, তার শক্তি ও মাহাত্ম্য সমাজের জন্য হয় তত অর্থপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়। সুতরাং মুনীর চৌধুরীর জীবনকাহিনী ও সাহিত্যকীর্তির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ও পর্যালোচনা গ্রন্থনের উদ্যোগ ভবিষ্যতে কার্যকর হবে, এই-ই আমরা আজ আশা করছি।

ছাত্র-জীবন থেকেই মুনীর চৌধুরী দেশের প্রগতিশীল ভাষান্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বাংলাকে তৎকালীন ডমিনিয়নের অন্যতর রাষ্ট্রভাষা, প্রদেশের সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার দাবীতে ছাত্রদের যে-সভা হয়, তাতে মুনীর চৌধুরী

ছিলেন প্রথম বক্তা। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জুন পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিষ্ট পার্টির কার্যসূচী প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে ঢাকা করোনেশন পার্কে যে জন-সভা হয়, তাতে সভাপতিত্ব করেন মুনীর চৌধুরী। সে-বছরের ৩রা ডিসেম্বর তিনি 'ঢাকা প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের' সম্পাদক নির্বাচিত হন। সে-সময় এদেশের রাজনীতিতে ও সংস্কৃতি-চিন্তায় তাঁর ছিল দুঃসাহসী পুরোগামীর ভূমিকা। আমি তখন কলকাতায় থাকতাম। কাগজে পড়তাম তাঁর কথা।

আমি তাঁকে প্রথম দেখি কলকাতায় ডেকার্স লেনে দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকা অফিসে। সে-অফিসে তিনি তাঁর এক বন্ধু-সহ সেদিন গিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তখন শুনলাম যে, মুনীর চৌধুরীর আব্বা মরহুম আবদুল হালিম চৌধুরী এক সময় মুজফ্ফর সাহেবের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। মুজফ্ফর সাহেব কথা-প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরীকে তাঁর বোন নাদেরা-বেগমের সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণার কথা বললেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সম্পর্কে বললেন যে, পাশ্চাত্যের যে-সকল রাষ্ট্রে একাধিক ভাষা রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রচলিত, তাদের নজির দিয়ে বাংলার দাবী করলে আন্দোলন জোরদার হবে। তিনি এ-সম্পর্কে কিছু তথ্য ও রেফারেন্স-পুস্তকের নাম উল্লেখ করলেন। মুনীর চৌধুরী নামগুলি লিখে নিলেন। পরে মুনীর চৌধুরীর মুখে শুনেছি, মুজফ্ফর সাহেবের সেদিনের নির্দেশ তাঁদের খুবই কাজে লেগেছিল।

মুনীর চৌধুরী যখন কারামুক্ত হয়ে এলেন, তখন আমি ঢাকায় সরকারী 'মাহে-নও' পত্রিকার সম্পাদক। সে-সময় প্রথম দর্শনেই তিনি আমাকে আত্মীয় হিসেবে গ্রহণ করেন। অতঃপর সব সময় তাঁর কাছে আমি অগ্রজের মর্যাদা পেয়েছি। তিনি মননধর্মী পাণ্ডিত্য ও সৃজনধর্মী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তাঁর আলাপে ও আচরণে কোনদিন উগ্রতা বা অসৌজন্য প্রকাশ পেতে দেখিনি। তিনি ছিলেন প্রকৃত জ্ঞানপন্থী,—আদর্শনিষ্ঠ অথচ নিরহঙ্কার, বিনয় ছিল তাঁর চরিত্রের মধুর ভূষণ। তিনি একাধারে ছিলেন গুণী ও গুণগ্রাহী। তাঁর অকৃত্রিম গুণগ্রাহিতা আমার মতো অনেককেই দিয়েছে মনের আনন্দ ও কাজের প্রেরণা।

তাঁর পাণ্ডিত্য তাঁর রচনায় কুশাঙ্কুরের মতো তীক্ষ্ণমুখ হয়ে নেই,—তাঁর ভাষার সরসতা ও প্রকাশশৈলীর পরিচ্ছন্নতার গুণে জটিল বিতর্কমূলক বিষয়ও তাঁর সুদক্ষ লেখনীতে হয়েছে রম্যকাহিনীর ন্যায় সুখপাঠ্য। শিল্পীর এক বড় গুণ তাঁর মনের প্রসন্ন অনাসক্তি,—মতের মোহ ও আবেগের অন্ধতা থেকে তাঁর সত্যসন্ধান ও শ্রেয়োজিজ্ঞাসা থাকে নিত্য নিমুক্ত। মুনীর চৌধুরীর সমগ্র সাহিত্য কর্ম সম্বন্ধে আগামীকল্য এখানে বিশেষভাবে আলোচনা হবে; আমি শুধু

৩—

তাঁর 'তুলনামূলক সমালোচনা' পুস্তকখানির আলোকে তাঁর মননশীলতা ও রস বিচারের প্রকৃতি একটু পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করব। 'তুলনামূলক সমালোচনা' তাঁর প্রখর পাণ্ডিত্য ও নিরাসক্ত সাহিত্য-সমীক্ষার উজ্জ্বল পরিচয় বহন করে। এরূপ তুলনাশ্রয়ী বিচার বাংলা সাহিত্যে সচরাচর চোখে পড়ে না। তাঁর বিচারকে নিখুঁত করার জন্যে মুনীর চৌধুরী যে ব্যাপক জ্ঞানসাধনা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তা সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে এক অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে থাকবে।

'তুলনামূলক সমালোচনা' পুস্তকের প্রথম প্রবন্ধ : 'ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায়।' ইংরাজ নাট্যকার জন (ড্রাইডেন ১৬৩১–১৭০০ খ্রীঃ) তার আওরংজীব : দি ইণ্ডিয়ান এম্পারার' (১৬৭৬) নাটক রচনা করতে গিয়ে দিল্লীর মহান মোগল বাদ্‌শাহের ফরাসী চিকিৎসক Francois Bernier ফ্রান্সিস্‌ বার্ণিয়ার (১৬২০—১৬৮৮)-এর ভ্রমণ কাহিনী Travels in Hindusthan ও ফরাসী নাট্যকার Jean Racine জাঁ রাসিন (১৬৩৯—১৬৯৯)-এর নাটক Mithridate (মিথ্রিডেট : ১৬৭৩) থেকে কতখানি উপকরণ আহরণ করেছেন, মুনীর চৌধুরী উক্ত প্রবন্ধে তা বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের প্রথম তিন সংস্করণে আওরংজীবের আবির্ভাব সর্বমোট পনের লাইনে সীমাবদ্ধ; তাতে জেবউন্নিসা নাই, জেবউন্নিসা মবারিকের প্রণয় নাই, দরিয়া নাই, দরিয়া মবারকের পরিণয় নাই; কিন্তু বঙ্কিম চন্দ্র দীর্ঘ পনের বছরের ব্যবধানে তার চতুর্থ সংস্করণে এ-সকল সংযোজন করেছেন। মনুচী, বার্ণিয়ার, অর্ম, টড প্রভৃতির পরিবেশিত নানা গাল-গল্প অবলম্বন ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দৈবী ক্ষমতার কিরূপ যাদুকরী খেলা দেখিয়েছেন, তা মুনীর চৌধুরী মনোজ্ঞ ভাষায় বিবৃত করেছেন। বার্ণিয়ার তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে সম্রাট শাহজাহানের সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা, জাহানারার অন্তরঙ্গতার যে-গুজব রটিয়েছেন, তার উল্লেখ মুনীর চৌধুরী করেছেন। বার্ণিয়ার এরূপ অকল্পনীয় কথাও বলেছেন যে, Dara had promised her that as soon as he should come to the crown, he would marry her একেই বলে ইতিহাস! এবং ইতিহাসাচার্য স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন, যে, 'বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' উপন্যাসে প্রকৃত ইতিহাসকে লঙঘন করেন নাই।' কিন্তু সে-ইতিহাসের কতটা বাস্তব ও কতটা অবাস্তব, তার ভেদতত্ত্বের মধ্যে যে একটা সূক্ষ্ম-স্থূল বঞ্চনা বিরাজমান, তা সাহিত্যিকের উদার দৃষ্টিতে উদঘাটিত ক'রে দেখিয়েছেন মুনীর চৌধুরী। তাঁর বক্তব্যে আছে শিল্পী-মনের শালীনতা এবং যুক্তি বিচারের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা।

১৮৯৩ সালে পুনা নগরীতে গো-বধ নিবারণী সভা স্থাপিত হয়; এই ব্যাপারে বোম্বাইয়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। সেই সময়ই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'রাজসিংহ' উপন্যাসের নব-লিখিত চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ ক'রে তার ভূমিকায় বলেন: 'হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য।' কিন্তু উগ্র হিন্দুত্বের উদ্বোধন বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হ'লেও তাঁর লোকোত্তর প্রতিভা 'রাজসিংহে' উন্মোচন করেছে মানব-জীবনের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও জটিল রহস্য। মুনীর চৌধুরী দেখিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য শিল্পীসত্তার যাদুস্পর্শে সম্রাট-দুহিতা জেবউন্নিসা জাগ্রত প্রেমের আগুনে ও আলোকে দীপ্যমান হয়ে অনন্তজগৎবাসিনী রমণীতে রূপান্তরিত হয়েছে—অন্তরাত্মার অনিমেষ জাগরণের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ সত্যভাবে লাভ করেছে। 'হিন্দুদিগের বাহুবল' নয়, মানব-চিত্তের চিরন্তন অনুভূতির বহু-বিচিত্র নিপুন আলেখ্য 'রাজসিংহে' প্রতিপন্ন করেছে বঙ্কিম-প্রতিভার প্রকৃত মর্যাদা।

মুনীর চৌধুরী তাঁর 'ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায়' লেখাটির উপসংহারে বলেছেন যে, আওরংজীব-চরিত্র ড্রাইডেনে মহাপ্রেমিক, বঙ্কিমচন্দ্রে শঠ, ডি. এল্. রায়ে অসংবদ্ধ ও ক্ষীরোদপ্রসাদে মহানেতা রূপে চিত্রিত হয়েছে। তিনি বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের অতি বিদ্বেষ এবং ক্ষীরোদ-প্রসাদের অতি প্রীতি সর্বাপেক্ষা অস্বাভাবিক ও অগ্রাহ্য। ড্রাইডেন মূলতঃ ইতিহাস-বিমুখ ব'লে তাঁর চরিত্র-নির্মাণ নাটকীয় হলেও আমাদের রসক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত না ক'রে বরঞ্চ পীড়িতই করে। ডি. এল্. রায় অনেকখানি ইতিহাসাশ্রয়ী হ'লেও তাঁর সৃষ্টি শৈল্পিক বিকাশের দিক দিয়ে অনুত্তীর্ণ; কারণ তিনি আওরংজীব-চরিত্রের প্রকৃতি-তাড়িত অপরিহার্য পরিণতি অঙ্কনে সফলকাম হননি। মুনীর চৌধুরীর এই নিরপেক্ষ নাট্যবিচার পাশ্চাত্যের প্রথম শ্রেণীর সমালোচনার সগোত্র।

মুনীর চৌধুরী তাঁর 'জাঁ রাসিন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে প্রচুর দৃষ্টান্ত সন্নিবেশ ক'রে দেখিয়েছেন যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' ও 'সরোজিনী' প্রচলিত দাবী অনুসারে 'মৌলিক রচনা' নয়; এ দু'টি বাংলা নাটক যথাক্রমে জাঁ রাসিনের Alexandre (১৬৬৫) ও Ephigenie (১৬৭৪) অনুসরণে রচিত। তবে 'পুরুবিক্রম' নাটকে যেখানে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রবল বীররসাত্মক অভিব্যক্তি লাভ করেছে এবং 'সরোজিনী' নাটকে যেখানে নিছক মানবিক দিক ছাড়া তার যাবনিক দিকের প্রতিও নাট্যকারকে লক্ষ্য রাখতে হয়েছে, সেই সেই অংশসমূহ স্বভাবতঃই 'মৌলিক', যদিও শিল্পবিচারে এই মৌলিক অংশসমূহই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

মুনীর চৌধুরী তাঁর 'মাইকেল ও শেক্সপীয়র' প্রবন্ধে শেক্সপীয়রের 'কিং হেনরী দি ফোর্থ' নাটকের প্রথম খণ্ডের ৫ম অঙ্কের প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ দৃশ্য থেকে এবং 'কিং লীয়ার' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে সাদৃশ্যমূলক সংলাপ উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়েছেন যে, মধুসূদন তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের মর্মরূপ গঠন করেন মুখ্যতঃ শেক্সপীয়রের প্রভাবে ও শিল্পরীতিতে। সুপণ্ডিত মুনীর চৌধুরী বেশ দুঃসাহস ও দৃঢ়তা দেখিয়েই বলেছেন যে, মাইকেলের অনুপ্রেরণার প্রধানতম উৎস শেক্সপীয়র, যদিও শেক্সপীয়র সম্পর্কে মাইকেলের সকল স্বীকারোক্তি অভ্রান্ত নয়।

মুনীর চৌধুরী তাঁর 'মহাবৎ খাঁ ও মহীপৎ সিংহ' প্রবন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'প্রতাপ সিংহ' (১৯০৫), 'নূরজাহান' (১৯০৮) ও 'মেবার পতন' (১৯০৮) এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'খাঁ জাহান' (১৯১২), এই পাঁচখানি ঐতিহাসিক নাটকে অঙ্কিত মহাবৎ খাঁর ভূমিকার স্বরূপ ও রূপান্তর বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন যে, হিন্দু-মুসলমানদের মিলন-তত্ত্ব প্রচারের এক বিভ্রান্ত বিকারগ্রস্ত বিরক্তিবর্ধক মানসিকতা এই নাটকগুলিতে প্রাধান্য বিস্তার করে।

১৮৬৭ সালে হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা করেন নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর । এই চৈত্রমেলা বাহিরে ছিল শিল্প-প্রদর্শনী; তার আন্তঃপ্রেরণা ছিল হিন্দুর পুনরুজ্জীবন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'মিলে সব ভারত-সন্তান' গানটি গেয়ে প্রথম মেলার উদ্বোধন হয়। এই গানটি দিয়েই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪) নাটকের গোড়াপত্তন করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন রায় বাংলায় যে-রিনেসাঁসের প্রবর্তন করেন, তার ভিত্তি ছিল মোহমুক্ত যুক্তিবিচার, উদার জাতীয়তা ও নব-মানবতাবোধ। কিন্তু হিন্দুমেলার আমলে এই চিন্তা মোড় নেয় হিন্দু পুনর্জাগরণের দিকে। মুনীর চৌধুরী বলেছেন: 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই হিন্দুমেলার ভারত-পথিক।' এখানে 'ভারত-পথিক' কথাটি ব্যাজস্তুতি-রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সান্ত কবীর কোনো ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান মানতেন না; তিনি ভারতকে দেখেছিলেন মহাপথ রূপে, নিজেকে বলেছিলেন 'ভারত-পথিক'। আর স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল যাঁকে বলেছেন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ---A Brahmin of the Bramins, সেই নৈষ্ঠিক রামমোহনকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন একালের 'ভারত-পথিক'। কিন্তু রামমোহনের ভারত-পথের, অর্থাৎ 'উনবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত বাঙ্গালী জাগরণের' ক্রমাবনতির প্রথম স্তরে ভারত-পথিকের আলখেল্লা প'রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরা নিলেন যে বিক্ষুব্ধ রিভাইভ্যালিস্টের ভূমিকা, তার প্রতিক্রিয়ায় ইতিহাসের

দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াতেই হয়েছে সাম্প্রদায়িক বিকার বুদ্ধির প্রসার। তার ফল বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিকাশকে করেছে কিরূপ বিকৃত ও ব্যাহত, মুনীর চৌধুরী সে-বিষয়টিই সযত্নে বিবৃত করেছেন। তাই তাঁর 'তুলনামূলক সমালোচনা' বইখানি বাংলাদেশের ও পশ্চিম বঙ্গের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রদের রেফারেন্স গ্রন্থ রূপে নির্বাচিত হলে জ্ঞান ও কল্যাণ সাধনার পথ হবে প্রসারিত।

পূর্বোক্ত 'ভারত-পথিক' কথাটিতে মুনীর চৌধুরীর মনের যে পরিহাসপ্রিয়তা প্রকাশ পেয়েছে, তাঁর 'দণ্ড', 'দণ্ডধর', 'দণ্ডকারণ্য' প্রভৃতি একাঙ্কিকায় দেখা যায় তার সার্থক শিল্পরূপ। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন তাজা মানুষ। তাঁর প্রখর প্রাজ্ঞতা থেকে উৎসারিত হতো স্বচ্ছ হিউমার। তাঁর উপস্থিতিতে মজলিশ হতো গুলজার। সাহিত্যের বৈঠকে তাঁর সরস ভাষণ হতো ক্লান্তিহরা, নীরস বিষয়ও তাঁর বাগ্মিতায় হতো আনন্দকর। আজ তিনি আমাদের মধ্যে থেকে অন্তর্হিত হয়েছেন, তাঁর অভাব তাঁর বন্ধুদের মনে সৃষ্টি করেছে যে-শূন্যতা তার নেই কোনো সান্ত্বনা।

তাঁর মরদেহের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। হয়নি তাঁর যোগ্য সমাধি। কিন্তু আমাদের পরম সান্ত্বনা এই যে তাঁর তুল্য অমর বীরদের অভঙ্গুর স্মৃতি সৌধ স্থাপিত রয়েছে সমগ্র দেশের জনগণের চিত্তে---বিশাল পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষদের শ্রদ্ধা-ভাস্বর মনোভূমিতে। তাঁর মতো উৎসর্গিত-প্রাণ বিদ্বত্তর শিল্পীর কীর্তিলিপি সমাধি প্রস্তরে সামান্যই উৎকীর্ণ থাকে—তা সকল মানুষের চিত্তে ক্ষোদিত থেকে দেশ ও কালের সীমা ছাড়িয়ে যায়।

মুক্তি-সংগ্রামের সক্রিয় পরিবেশে যাঁরা প্রাণ দেন, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের সকল বিতর্কিত ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁদের আত্মোৎসর্গের মহিমার তলে নিঃশেষে ঢাকা প'ড়ে যায়। আমাদের প্রিয় বীরদের ক্ষেত্রেও গৌরবের এই যে, মৃত্যুকে এড়াবার জন্যে কোনো দুর্বলতা বা অসম্মানের পথে তাঁরা পা বাড়াননি। তাঁরা জানতেন যে, মুক্তিতেই চিত্তের সুখ এবং মুক্তি আসে আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে---এই আত্মোৎসর্গ ঘটে যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে তেমনই যুদ্ধের অনুষঙ্গে। সম্মানবোধ---The spirit of honour মানুষকে করে কালজয়ী। মুনীর চৌধুরী চেয়েছিলেন সমকালের সংস্কৃতিবান জীবন কিন্তু সর্বকালের সম্মানিত জীবন,---সেই লক্ষ্যের অনবসর সাধনাতেই হয়েছে তাঁর জীবনাবসান। তাঁর অকালমৃত্যু থেকে শিল্প ও সাহিত্যের সাধকদের একটি বিষয় শিক্ষণীয় আছে। জীবন অত্যন্ত অনিশ্চিত; যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো অভাব্য কারণে মানব-জীবন মৃত্যুর কবলিত হতে পারে; অতএব সকল ক্ষুদ্র লোভ, অকিঞ্চিৎকর চিন্তা, সামান্যের

আকাঙ্খা সজ্ঞানে পরিহার ক'রে তাঁদের স্ব স্ব সৃষ্টিব্রতে সদা আত্মনিয়োজিত থাকা আবশ্যক। অর্থ, খ্যাতি ও হাততালি লাভের আশায় তাঁদের অমূল্য সময় ও অনন্যসুলভ শক্তির অপচয় করা কদাচ উচিত নয়। মুনীর চৌধুরী প্রথম বয়সে প্রগতিমুখী রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু আমি কখনও তাঁর মুখে রাজনীতির আলোচনা শুনিনি। জেলে গিয়ে তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে এসেছিলেন; তাতে তাঁর জীবনশক্তির ক্ষয় হয়েছিল অপূরণীয়। মনে হয় তিনি যদি সারা জীবন নিজেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্য ও সংস্কৃতির সেবায় নিবিষ্ট রাখতে পারতেন, তা হলে তাঁর হাতে অনেক অমর অবদান লাভ ক'রে দেশ ও সমাজ সমধিক ধন্য হ'তে পারত। তবুও তাঁর স্বল্পপরিসর জীবনে তিনি যা দিয়ে গেছেন, তার পরিমাণ বেশী না হলেও অনুপাতে মূল্য অনেক বেশী। তাঁর জীবন ও সৃষ্টির আলোকে তাঁর মাহাত্ম্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিমাপ ভবিষ্যতের সমালোচক করবেন, এইই আমরা আজ আশা করছি। প্রার্থনা করছি তাঁর বিদেহ আত্মার স্থৈর্য লাভ হোক। আমীন।

মুনীর চৌধুরী : সাহিত্যকর্ম

আনিসুজ্জামান

বিশে মার্চ সোমবার বিকাল চারটা

তাঁর প্রথম নাট্যগ্রন্থ 'রক্তাক্ত প্রান্তরে' মুনীর চৌধুরী কল্পনা করেছিলেন অতুলনীয় প্রাণহানির এক বিষাদময় ক্ষেত্র, অপরিমেয় ক্ষয়ক্ষতির এক ভয়ঙ্কর পরিণাম। ভূমিকায় নাটকের পাত্রপাত্রীদেরকে তিনি অভিহিত করেছিলেন 'মহাযুদ্ধের এক বিষময় পরিবেশের শিকার'রূপে। বলেছিলেন, 'নিজেদের পরিণামের জন্য তারা অংশতঃ দায়ী হলেও তাদের বেশীর ভাগের জীবনের রূঢ়তম আঘাত যুদ্ধের সূত্রেই প্রাপ্ত।' নাটকের সমাপ্তি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন যে, যুদ্ধের অবসানে যে-ক'টি 'মানব-মানবীর হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করি, তাদের সকলের অন্তর রণক্ষেত্রের চেয়ে ভয়াবহরূপে বিধ্বস্ত ও ক্ষতবিক্ষত।'

'রক্তাক্ত প্রান্তর' প্রকাশিত হবার দশ বছর পরে নাটকের এই অলীক বাস্তবতা কী ভয়াবহ সত্যতার সঙ্গেই না দেখা দিল আমাদের জীবনে। আর সে-ভয়াবহতার শিকার হলেন মুনীর চৌধুরী স্বয়ং। নাটকের মধ্যভাগে ইব্রাহিম কার্দি যে-ভাষায় নিজের ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, জীবনের পরিণামে নাট্যকারের চেতনায় হয়তো সেই ক'টি কথাই চকিতে ধরা দিয়েছিল।

> 'হয়তো এমন এক সময়ে এসে তুমি আমার সামনে দাঁড়াবে যখন রক্তের বন্যায় এই প্রান্তর ডুবে গেছে। ঢেউয়ের দোলায় দোলায় আমি কেবলই নীচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছি। তোমাকে দেখবো বলে যতোবার চোখ খুলতে চাইছি ততোবারই রক্তের ঝাপটায় সব গুলিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে।'

চিরবিদায়ের মুহূর্তে একজনের কাছে সব কিছুই বুঝি এমনি করে একাকার হয়ে যায়। একাকার হয় না শুধু তাদের কাছে, যারা ভাগ্যক্রমে বেঁচে থাকে। আর তাই সহস্র মুখের ভিড়ে আমরা আলাদা করে চিনতে পারি মুনীর চৌধুরীকে। চিনতে পারি শুধু আদর্শ শিক্ষক ও কুশলী বক্তারূপে নয়, সফল নাট্যপ্রতিভা

ও ক্ষুরধার সমালোচকরূপে, জীবনের এক অনন্যসাধারণ রূপকার ও সমাজচেতনায় দীপ্ত পুরুষরূপে।

মুনীর চৌধুরীর এই পরিচয় উদ্‌ঘাটনই আজ আমার দায়িত্ব। কিন্তু সে-দায়িত্ব গুরুভার এজন্যে যে, তাঁকে খুব নিকট থেকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। একই সঙ্গে তাঁকে আমি পেয়েছি আমার শিক্ষকরূপে, অগ্রজরূপে, সহকর্মীরূপে, বন্ধুরূপে। খুব কাছ থেকে তাঁর মর্মবেদনা ও জীবনোল্লাস লক্ষ্য করেছি, তাঁর আশা-হতাশার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, তাঁর জীবনভাবনা ও শিল্প সৃষ্টির প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেছি। আমি তাঁর দ্যুতিময় ব্যক্তিত্বের আলোকে লালিত, তাঁর পরিশীলিত সাহিত্যরুচির কাছে ঋণগ্রস্ত। বিচার করা তাই আমার কাজ নয়। আমার বিধ্বস্ত ও ক্ষতবিক্ষত অন্তরে জ্যোতির্ময় হয়ে রইল তাঁর স্মৃতি, উজ্জ্বল হয়ে রইল তাঁর সাহিত্যপাঠের আনন্দময় অনুভূতি। আজ স্মৃতিচর্চা করব না, শুধু সেই পাঠের পরিচয় দেব।

দুই

মুনীর চৌধুরী একথা প্রায়শঃই বলতেন যে, অধ্যাপনা তাঁর পেশা হলেও তাঁর নেশা হল নাটকে—নাটক-রচনায়, অনুবাদে, প্রযোজনায়, অভিনয়ে। তিনি আরো বলতেন যে, নাট্যচর্চা করে যদি তিনি সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে সমর্থ হতেন, তাহলে হয়তো অধ্যাপনা করতেন না। আমরা যারা শুধুই শিক্ষক, তারা তাঁর এই উক্তিতে একটু আহত না হয়ে পারতাম না। কিন্তু এই উক্তি তাঁর পক্ষে সত্যভাষণ ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রথম একাঙ্কিকা যখন মঞ্চস্থ হয়, তখন তিনি কুড়ি বছরের যুবক মাত্র। দেশ-বিদেশের নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় তখনই অন্তরঙ্গ হতে শুরু করেছে, একাঙ্কিকার সাথে সাথে ছোটগল্প-রচনাও শুরু করেছেন তিনি। 'রাজার জন্মদিনে', 'ন্যাংটার দেশে', 'ভিটামিন'—এসব রচনার কথা আমরা শুনেছি মাত্র। ঢাকা বেতারের জন্যে অবহেলাক্রমে যেসব নাটক তিনি লিখেছিলেন, সেগুলোও অক্ষরে স্থায়িত্বলাভ করেনি। সেকালে লেখা তাঁর দু-একটি ছোটগল্প অবশ্য কালের আঘাত কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। যেমন, 'মানুষের জন্য'। পল্লীসমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের ক্রোধ-ভালবাসা, স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও শরিয়তের অসম্পূর্ণ জ্ঞানের পটভূমিকায় ব্যক্তি-জীবনের সংঘাত ও সংকটের একটি মোহনীয় কাহিনী। চরিত্রের মর্মোদঘাটনের দক্ষতার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগের নৈপুণ্যের যোগে এবং বিষাদময় ঘটনার সঙ্গে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টির সমাবেশে আশ্চর্য উপভোগ্য গল্প। গল্পের সূচনায়

গালিগালাজের যে সুদীর্ঘ বর্ণনা আছে মুদ্রণের অযোগ্য একটি শব্দেরও ব্যবহার না করে, গল্পলেখক মুনীর চৌধুরীর কৌশলের পরিচয় সেখানে পাওয়া যাবে। 'খড়ম' গল্পে অন্নবস্ত্রাভাবের পটভূমিকায় লোলুপতার ক্ষণিক শিকার একটি মেয়ের কথা আছে। সেখানেও সূক্ষ্মতা ও নাটকীয়তার চমৎকার সমন্বয়, আঞ্চলিক সংলাপের ব্যবহারে জনজীবনের বাস্তবতার প্রকাশ, আর লেখকের নির্লিপ্ততায় ফুটে ওঠা তীক্ষ্ণ জীবন-সমালোচনা।

শক্তিশালী গল্পলেখক হবার এ-সম্ভাবনাকে মুনীর চৌধুরী কাজে লাগান নি। তার প্রধান কারণ হয়তো নাটকে তাঁর অসাধারণ আসক্তি। তাঁর নাট্যপ্রতিভা বিকশিত হয়েছিল, লাভ করেছিল পূর্ণতা। তবে তার ক্রমবিকাশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা সহজ নয়। কারণ তাঁর নাটকগুলো রচনাকালের ধারাবাহিকতা অনুসারে প্রকাশ লাভ করেনি এবং প্রকাশিত নাটকেও সব সময়ে রচনাকাল উল্লেখিত হয় নি। সুতরাং কালানুক্রমের ক্ষেত্রে কিছুটা অনুমানের আশ্রয় না নিয়ে উপায় নেই।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে মুনীর চৌধুরীর দুটি পূর্ণাঙ্গ নাটক এবং তিনটি সংগ্রহে বারোটি একাঙ্কিকা। এর মধ্যে চারটি গুরুতর একাঙ্কিকায় তাঁর সেই মন ও মেজাজের পরিচয় আছে, যাকে তিনি 'ক্ষোভপূর্ণ, অভিযোগাশ্রয়ী ও রক্তাক্ত' বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক চেতনার ও অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর এই একাঙ্কিকাগুলোতে সবচেয়ে প্রদীপ্ত। তাছাড়া, এদেশের ইতিহাসের অনেক অধ্যায়ও সেখানে লিপিবদ্ধ।

যেমন, 'পলাশী ব্যারাক'। এর ঘটনাকাল ১৯৪৮, ঘটনাস্থল নিম্নশ্রেণীর সরকারী চাকুরেদের জন্যে নির্মিত পলাশী ব্যারাক, পাত্রেরা মুখ্যতঃ কেরানী। পাত্রীর স্থান নেই মঞ্চে, কেননা তারা পাত্রদের জীবনবৃত্তের অনেকখানি বাইরে অবস্থান করে। সূচনায় এককালে অঙ্কের কৃতী ছাত্র মারুফকে কাগজ-কলম এগিয়ে দিয়ে হাবিব আহ্বান জানায়ঃ

> করুন, হিসেব করুন। দেখি আপনি কত বড় জাঁদরেল ম্যাথমেটিশিয়ান। প্রতি ঘর প্রস্থে চৌদ্দ হাত দৈর্ঘ্যে পনের হাত, প্রতি ব্লকে পঁচিশটা ঘর, প্রতি ঘরে দশজন করে মানুষ, সবগুলো ব্যারাক মিলিয়ে এখানে থাকে চার হাজার কর্মচারী। এক একটা ব্লকের জন্য মাত্র একটা করে কল, তাতে পানি থাকবে সকাল সাতটা থেকে দশটা অবধি, কলের মুখের ব্যাস কোয়ার্টার ইঞ্চি, পানি পড়বে ঝির ঝির করে—

হতবাক মারুফ শুধু বলতে পারে 'এঁ্যা', আর তা শুনে হাবিব আবার তেড়ে ওঠেঃ

এঁ্যা নয়, হিসেব করুন। অঙ্ক করে বলুন ঐ পানি দিয়ে মুখ ধোবার আমার কোনো হক আছে কি নেই। হিসেব করে আপনাকে বলতে হবে ও পানি অপিসে যাবার আগে আমার রূহ দেখতে পাবে কি না।

হাবিব এবং মফিজ উভয়েরই অসহনীয় ক্রোধ প্রকাশ পায় নিজেদের জীবন-যাত্রার উপর। পানের অযোগ্য গুড়ের-চা, চলাফেরার অযোগ্য হারমোনিয়মের -রীডের-মতো-ঘরের-পাটাতন, ব্যবহারের অযোগ্য পায়খানার-ভেঙে-পড়া-দরজা। যতই হিসেব করে চলুক, প্রতি মুহূর্তেই অস্বাচ্ছন্দ্য, তার উপর নিত্যকার অভাব। হাবিব ক্ষেপে ওঠে:

ক্ষেপব না। ভোরবেলায় মুখ ধুতে পারি না কণ্ট্রাকটরের নাফরমানির জন্য। বেটাকে জেলে পুরতে পারছি না মন্ত্রী শালার সঙ্গে ওর টাকার সম্বন্ধ বলে; যা বেতন পাই তাতে বৌকে মেরে ফেলতে হবে গলা টিপে, বিষ কেনার বাড়তি পয়সা নেই বলে; পাকিস্তানের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারব না দেহত্যাগ করতে হবে বলে---আর আমি ক্ষেপব না।

অঙ্কবাগীশ হাবিব কিন্তু আশাবাদী। সে হিসেব করে বাড়িতে যাবার একটা উপায় বার করেছে। বাসে না চড়ে, ধোপায় দুবার কাপড় কম দিয়ে, চুল না ছেঁটে সে মাসে প্রায় দশ টাকা জমাতে পারবে। আট মাস পরে জমবে আশি টাকা। ত্রিশ টাকা রাহা খরচ বাদে বৌয়ের শাড়ি, ছেলের জামা ও মেয়ের জন্যে কিছু একটা কিনতে পারবে। কিন্তু শেষে তার হিসেবে গোলমাল হয়ে গেল:

কাবিননামার শর্তই আমি ভুলে গিয়েছিলাম। বৌ মনে করিয়ে দিল যে, কাবিননামায় না কি শর্ত দেয়া হয়েছিল যে, ছ মাসে একবার বিবির মুখ দর্শন না করলে পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে আমায় তালাক মঞ্জুর করতে হবে। আমি অত টাকা কোথায় পাবো? আমার যে আশি টাকা জমাতে আট মাস কেটে যাবে। ও হো হো—সব যে হিসেবে ভুল হয়ে গেল। ও হো হো।

মুনীর চৌধুরীর নাট্যস্বভাবের অনেকখানি এই একাঙ্কিকায় উন্মোচিত হয়েছে। তাঁর সমাজচেতনার বিশিষ্ট প্রকাশ এখানে ঘটেছে রঙ্গব্যঙ্গের আড়ালে। বেদনাকে সব সময়ে ঘিরে রেখেছে কৌতুকবোধ। সেই অভিনবত্বই এই রচনার প্রাণ। স্ত্রী-তালাকের বেদনাময় পরিণামের চেয়ে মোহরানার টাকা কোথায় পাবে হাবিবের এই প্রশ্ন যখন উচ্চকিত হয়ে ওঠে, তখন হাসিতে--করুণে, মেশামিশিতেই নাটকের রস উৎথিত হয়। সংলাপরচনায় নাট্যকারের পরবর্তীকালের নৈপুণ্য তখনও অপেক্ষিত। ফলে এসব সংলাপ যত তীব্র, তত তীক্ষ্ণ নয়, কথার যাদু

এখানে অনুপস্থিত। আর অনেকটা সেই কারণেই এর চরিত্রগুলো মোটা রঙে আঁকা।

'নষ্ট ছেলে' বা 'মানুষ' অনেকটা এই আদর্শেই গড়া, যদিও চরিত্রনির্মাণে ও সংলাপরচনায় তিনি আরেকটু কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। 'নষ্ট ছেলে'র পটভূমিকা ১৯৪৮ বা তার পরবর্তী : এক আত্মগোপনকারিণী রাজনৈতিক কর্মীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এই রচনাটি। 'মানুষে'র পটভূমি ১৯৫০-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ঘটনার আকস্মিকতা উভয় রচনাতেই নাটকীয়তা সৃষ্টির একটি মূলসূত্র। আশ্রয়প্রার্থী হিন্দু ডাক্তারকে পর্দানশীন মুসলিম মহিলা যে তাঁর বিছানায় মশারির নিচে স্থান দিয়ে প্রাণ বাঁচালেন, এটা নাটকের স্থূল ঘটনা মাত্র। এর প্রাণশক্তি ফরিদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে, আব্বার সন্দেহপ্রবণতায়, নাটকে অনুপস্থিত মোর্শেদের মৃত্যুতে, এমন কি রুগ্ন সন্তানের প্রাণদানকারী হিসেবেই ডাক্তারকে বাঁচাবার চেষ্টায় মায়ের সূক্ষ্ম স্বার্থপরতায়। নাটকের মর্মবাণী ডাক্তারের আত্মপরিচয়দানের বাস্তবতায় নিহিত : 'আমি মানুষ'।

'নষ্ট ছেলে'তে আমাদের মূল্যবোধকে বেশ প্রত্যক্ষ আঘাত করা হয়েছে। ইতিহাসের অধ্যাপক এমরান যখন বলেন, চুরির রকমফের আছে, শুধু অর্থ আত্মসাৎ করলেই চুরি হয় না, শ্রম আত্মসাৎ করলেও চুরি হয়, তখন মুনীর চৌধুরীর একটি বিশেষ প্রত্যয় ঘোষিত হয়। তেমনি খোকা বা আমিনকে দিয়ে আমরা বুঝি মিথ্যে ভাষণেরও প্রকার-ভেদ আছে। আবার এমরান যখন বলেন,

> আমিনকে ছেলেমানুষ বোলো না। ওর বয়স কত জান? আমার বাহান্ন বৎসর এটা ওর, তোমার আটাশ সেটাও ওর, নতুন পৃথিবীর কয়েক হাজার বছরের অতীত তাও ওর, সেই সঙ্গে ওর নিজের বার বছর। সব যোগ করে তবে ওর বয়স।

তখন নাট্যকারের ইতিহাসচেতনার একটা স্বরূপ আমাদের কাছে সহজেই ধরা পড়ে। তাঁর নাটকীয় কৌশল এখানে শেষটায় প্রকাশ পেয়েছে ছদ্মবেশের অবতারণায়—এ-পরিকল্পনা হয়তো শেক্‌সপীয়র থেকে তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর পরবর্তী নাট্যরচনায়ও ছদ্মাবরণের বারংবার ব্যবহার থেকে সে-কথাই মনে হয়।

এই পর্যায়ের রচনাগুলোর মধ্যে ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা 'কবর' তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। মুনীর চৌধুরীর উদ্ভাবন নৈপুণ্য এর সর্বত্র প্রকাশিত। রাজনৈতিক চেতনার এমন কল্যমণ্ডিত রূপ আমাদের সাহিত্যে খুব অল্পই দেখা গেছে। একথা এখন সুবিদিত যে, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থান-কালে রণেশ দাশগুপ্তের অনুরোধক্রমে মুনীর চৌধুরী 'কবর'-রচনায় প্রবৃত্ত হন। জেলখানায় যাতে গোপনে অভিনীত হতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই 'কবর'

লিখতে হয়েছিল। মঞ্চটাকে দুভাগে ভাগ করে নিয়ে হারিকেনের ব্যবহার করে এর রূপায়নের নির্দেশ ছিল। মঞ্চের উপকরণের শোচনীয় অভাবকে মেনে নিয়ে যিনি এমন চিরন্তন মূল্যের নাটক উপহার দিতে পারেন, তিনি অলোকসামান্য প্রতিভা।

'কবরে'র বিশিষ্ট গুণ এর সংলাপের তীক্ষ্ণতা ও পারিপাট্য। মুর্দা ফকির যখন নেতা ও ইনপেক্টরের উদ্দেশ্যে বলেন,

গন্ধ! তোমাদের গায়ে মরা মানুষের গন্ধ! তোমরা এখানে কি কোরছো? যাও, তাড়াতাড়ি কবরে যাও!

আর শহীদেরা যখন ধ্রুবপদের মতো উচ্চারণ করে, 'আমরা কবরে যাবো না', তখন নাট্যকারের এবং সেই সঙ্গে আমাদের—একটা বিশেষ প্রত্যয় ঘোষিত হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ছাত্রকে কবরে যেতে প্রবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করতে গিয়ে নেতা যখন বলেন—'অনেক কেতাব পড়েছ। তোমার মাথা আছে।'—আর সঙ্গে সঙ্গে মূর্তি যখন জবাব দেয়,

ছিল। এখন নেই। খুলিই নেই। উড়ে গেছে।

ভেতরে যা ছিল রাস্তায় ছিট্‌কে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

কিংবা হাইকোর্টের শহীদ কেরানীকে নেতার প্রশ্ন 'তুমিও এই দলে এসে জুটেছো নাকি?' আর তার উত্তরে সে যখন বলে,

গুলি দিয়ে গেঁথে দিয়েছেন। ইচ্ছে করলেও আল্‌গা হতে পারবো না।

তখন এসব সংলাপের সরসতা, বিশিষ্টতা ও নাটকীয়তা মুনীর চৌধুরীর স্বাতন্ত্র্যকে পরিস্ফুট করে।

পরিহাসতরল আবহাওয়ায় ছদ্মাবরণের সাহায্যে দুটি করুণ দৃশ্যের সাঙ্গীকরণ এই নাট্যের আরেকটি প্রধান গুণ। নাটকীয়তা সৃষ্টিতে এ দুটি অংশের গুরুত্ব খুব বেশি। এই দুই অংশে এবং মুর্দা ফকিরের বৃত্তান্তে মুনীর চৌধুরী ভাষা-আন্দোলনকে অতিক্রম করে আমাদের সামাজিক জীবনের বৃহত্তর দ্বন্দ্বের দিকে অঙ্গুলিসংকেত করেছেন। যবনিকার একটু আগে নেপথ্যে মুর্দা ফকিরের চীৎকারও সেই বৃহত্তর দ্বন্দ্বের দ্যোতনা করে:

তোরা কোথায় গেলি? সব ঘুমিয়ে নাকি? উঠে আয়। তাড়াতাড়ি উঠে আয়। সব মিছিল করে উঠে আয়। গুলী গুলী হবে! স্ফুর্তি করে উঠে আয় সব কোথায় গেলি? সব উঠে আয়। মিছিল করে আয় এদিকে। আজ গুলী—গুলী হবে আজ। কবর খালি করে সব উঠে আয়!

পূর্ববর্ণিত একাঙ্কিকা-চতুষ্টয়ের সংলগ্ন আর দুটি একাঙ্কিকা হল 'ফিট কলাম'

ও 'মিলিটারী'। 'ফিট কলামের' ঘটনাকাল ১৯৪৮, 'মিলিটারী'র ১৯৫০। অসংগতি ও কৌতুকবোধ উভয় নাট্যেই প্রবল। 'মিলিটারী'তে কারফিউর মধ্যে একদিকে তরুণ-তরুণীর হৃদয়-বিনিময়, অন্যদিকে গুণ্ডাদের অগ্নিসংযোগের প্রচেষ্টা। সংলাপ তীক্ষ্ণ, বাক্য কাটাকাটা, বাক্‌বৈদগ্ধ্য সর্বত্র উপস্থিত। যেমন,

মেয়ে : আমি ভেবেছিলাম এই রাত, কারফিউ, দাঙ্গার রক্তস্রোত, এই মিলিটারী টহল, সব মিলে সত্যি বুঝি তুমি পাগল হয়ে গেছ। আমাকে ছিনিয়ে নিতে ছুটে এসেছো।

তরুণ : এসেছিলাম।

মেয়ে : মিথ্যুক। তুমি ষ্টেশনে গিয়ে আগে সংবাদ নিয়ে এসেছো যে, বাবার আজ নাইট ডিউটি। ফিরবেন কারফিউর পর। পিসিমা দেশে। মণ্টু তোমার ভক্ত। আমি দাসী। তাই এসেছো নির্ভয়ে নিষ্পাপ প্রেমকাব্য শোনাতে। নিজের মনোবিলাসকে তুষ্ট করতে। যা ভুলে যাবার চেষ্টায় আমার রক্তমাংস কাদাকাদা হয়ে গেল সেখানে তুমি কেন মিথ্যে করে স্বপ্নের ফুল ফোটাতে চাইলে। তুমি বঞ্চক। তুমি নিষ্ঠুর। যাও। দূর হও।

কিংবা

তরুণ : তুমি কি করে জানলে যে আমার কারফিউ পাস আছে?

মেয়ে : মেয়েরা জানে। সব জানে। তুমি প্রেমিক না হলেও সাংবাদিক। নাইট ডিউটির পর পাস না নিয়ে তুমি বাড়ী ফিরবে—একথা ভাবতে যাবো কেন?

এইসব কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে গুণ্ডারা তাদের অনুপম সংলাপে অগ্নিসংযোগের পরিকল্পনা করতে থাকে এবং মিলিটারী গাড়ির আওয়াজে, আবার আত্মগোপন করতে থাকে। এক সময়ে তারা আবিষ্কার করে যে, কেরাসিন থাকলেও দেশলাইয়ের বাক্স শেষ হয়ে গেছে, সিগারেট খেতেই। শেষে দেশলাই সংগ্রহ করে এনে দেখে যে, কেরাসিনের টিন নিয়ে চলে গেছে টহলদার সামরিক প্রহরীরা। কপালে করাঘাত করে তখন ওস্তাদ এই নাট্যের শেষ বাক্যটি উচ্চারণ করেঃ 'শালারা কওমের খেদমত করবার দিল না!'

মুনীর চৌধুরীর স্বভাবের এই দিকটির কথা আগেও বলবার চেষ্টা করেছি, পরেও আবার বলতে হবে। তাঁর সমালোচনা সব সময়েই কৌতুকাশ্রিত, তির্যক, পরোক্ষ। করুণের সঙ্গে হাস্যরসের মিশ্রণ, গুরুতর পরিবেশের মধ্যে হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভাবন তিনি স্বভাবতঃই ঘটান। 'ফিট্ কলামে' পলাতক রাজনৈতিক কর্মী সন্দেহে কোন বোরখা পরিহিতার কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করে

পুলিশ বাহিনীর লোক। এ থেকেই ঘটনার সূত্রপাত। তুমুল বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যে রসিক টিপ্পনী কাটে, ফক্কড় জোগান দেয়, মুসল্লী শরিয়তের প্রশ্ন তোলে, অভিনেতা মেলোড্রামার সন্ধান করে। কোলাহলের মধ্যে বোরখা-পরিহিতা অন্তর্ধান করে। ব্যাপারটা আসলে কি, জিজ্ঞেস করা হলে দোকানী বলে :

ক্যাম্বায় কমু! বোরখা পরলেই মরদ যদি আওরত হইবার পারে, তবে আওরত দেখলে গুণ্ডা সি. আই. ডি. হইবার পারব না ক্যান?

নাটকে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার মুনীর চৌধুরী কদাচিৎ করেছেন—'মিলিটারী' ও 'কিট কলামে' সে-ভাষার সিদ্ধপ্রয়োগের পরিচয় আছে।

আই. বি-র লোককে নিয়ে আরো একটু ঠাট্টা আছে 'আপনি কে?' একাঙ্কিকায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিচিত্র পোশাকে বনভোজন করতে গিয়েছিল, কিন্তু খাদ্যসামগ্রী ট্রেনে ফেলেই তারা গন্তব্যস্থানে নেমে পড়ে। হৃদয়ের সংঘাতে আর খাদ্যের অভাবে সমস্ত পরিস্থিতি যখন নিদারুণ হয়ে উঠেছে, তখন তাদের অনুসরণকারী পুলিশকর্মী খাদ্যবস্তুসকল নিয়ে উপস্থিত হয়। 'দেবতা, অবতার, ফেরেশতা, ফকির, দরবেশ, আউলিয়া, সেইণ্ট' বলে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ছাত্রছাত্রীরা তার পরিচয় জানতে চায়। সকলকে নিশ্চল ও স্তব্ধ করে দিয়ে তখন সে আত্মপ্রকাশ করে।

বলা বাহুল্য, এ-রচনার বিষয়বস্তু তুচ্ছ। যেমন তুচ্ছ 'একতালা দোতালা' কি 'বংশধরে'র বিষয়। তাঁর অন্যান্য কৌতুকনাট্যের ('দণ্ড', 'দণ্ডধর' ও 'দণ্ডকারণ্যে'র) বিষয়বস্তু ও বক্তব্যও জটিলতামুক্ত। কিন্তু এসব নাট্যের মনোহারিত্ব হচ্ছে, এর রচনারীতিতে। এসব রচনায় তাঁর প্রতিভা বিশেষ স্ফূর্তি পেয়েছে সংলাপ রচনার নবতর ভঙ্গিতে এবং সামান্য ঘটনার জটিলতা সৃষ্টিতে। 'বংশধর' একাঙ্কিকার সূচনা লক্ষ্য করুন :

বাবা : সেই বাঁদরটা কি আজও এসেছে নাকি?

মা : রোজই তো আসছে।

বাবা : কখন আসছে?

মা : সকালে-বিকালে-দুপুরে, যখন পারছে তখনই লাফিয়ে ঢুকে পড়ছে। ওই বজ্জাতের আবার সময়-অসময় আছে নাকি?

বাবা : বলো কি, এতদূর গড়িয়েছে! হতভাগার এতবড় দুঃসাহস!

মা : তুমি ত আমার কোনো কথায় মনোযোগ দিয়ে পুরোপুরি শুনতে চাও না। নইলে, গতকাল দুপুরে যে কাণ্ডটা ঘটে গেল, মনে হলেও সারা গা শিউরে উঠে।

বাবা : কাল দুপুরে কি হয়েছে? সব কথা খুলে বল।

মা : বলছি। আমেনাকেও আসতে দাও। তোমার জন্য নাস্তা তৈরি করছে। ও আসুক। ওর সামনেই সবটা বলা দরকার।

বাবা : ওর সামনে বলার কোনো দরকার নেই। আগে সবটা আমাকে খুলে বলো।

মা : তোমার সবটাতেই বেশী ব্যস্ততা। বলছি। দুপুর বেলা তুমি অফিসে চলে গেছ। আমেনাও খাওয়ার আগেই ইউনিভার্সিটি থেকে চলে এসেছে। দু'জনে এক সঙ্গে হাত লাগিয়ে খাওয়া-দাওয়ার জিনিস গুছিয়ে নিয়ে যেতে বসেছি। ভেতরের বারান্দার দরজা দুটোই বন্ধ, সিঁড়ির দরজাটাও বন্ধ। সব আটঘাট বেঁধে তবে খেতে বসেছি। মেয়েকেও রেখেছি চোখের সামনে।

বাবা : তারপর ?

মা : সবে খেতে শুরু করেছি, বললে বিশ্বেস করবে না, ঠিক সেই সময়ে সিঁড়ির দরজায় বাইরে থেকে ঠক্ ঠক্ করে টোকা দিল।

বাবা : এতবড় সাহস বাঁদরটার। আমি বাড়ী থাকবো না জেনে, দুপুর বেলা এসে বন্ধ দরজায় টোকা দেয়!

মা : সে কি, তুমি আন্দাজ করলে কি করে।

বাবা : ওর বাপ মা চৌদ্দগোষ্ঠির খবর রাখি। আর এইটুকু আন্দাজ করতে পারব না ?

মা : কার কথা বলছ তুমি ?

বাবা : কেন ঐ বাঁদরটার। ঐ তোমাদের আশরাফের কথা বলছি।

মা : হায় খোদা, কিসের মধ্যে কি ? তোমার সঙ্গে গলা করাও ঝক-মারি। আমি বলছি এক কথা, তুমি ভাবছ অন্য কথা। হঠাৎ করে আশরাফের কথা তুললে কেন ?

বাবা : তুমি ত বললে দরজায় এসে টোকা দিল।

মা : কে টোকা দিয়েছে তা তুমি জানলে কি করে ?

বাবা : কে টোকা দিয়েছে ?

মা : তুমি আমাকে বলতে দিলে ত ?

বাবা : নাও, বলো, শুনছি।

মা : আমি অন্য কিছু ভাবতেও পারিনি। ভেবেছি, হয়ত পিওন, ফেরিওয়ালা কেউ হবে। আমেনাকে বললাম উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দেখতে। ও হাসিমুখে উঠে গেল।

বাবা : তখনও তোমার সন্দেহ হল না ?

মা : কিন্তু, তারপর যা কাণ্ডটা হল দরজা খুলেই ও চীৎকার করে ছিটকে পেছনে সরে এল। চোখ তুলে দেখে আমিও হতভম্ব। সেই কালামুখ হুলো বাঁদরটা।...

বোঝা ও বোঝানোর মধ্যে এখানে যে-ব্যতিক্রম সূচিত হয়েছে, নাটকের রস ও দর্শকের উৎকণ্ঠার মূল সেখানেই। তেমনি 'দণ্ড' একাঙ্কিকায় একজনের উচ্চারিত প্রশ্ন যখন খানিক পরেই অন্যজনের মুখ থেকে তার দিকেই ফিরে আসে, তখন আমরা নাটকীয়তার তৃপ্তিকর আস্বাদ লাভ করি।

মুনীর চৌধুরীর এই ধরণের নাট্যপ্রয়াস---যাকে তিনি 'কৌতুকাবহ, অন্তরাশ্রয়ী এবং অদ্ভুতরসাত্মক' বলে অভিহিত করেছেন—তার মধ্যে, আমার বিশ্বাস 'দণ্ডধর' সবচেয়ে সার্থক এবং 'দণ্ডকারণ্য' সবচেয়ে কম সন্তোষজনক। তার একটা কারণ হয়তো এই যে, 'দণ্ডধরে'র জগৎ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাই, বিশেষতঃ যারা নাটকাভিনয় করে অধ্যাপকের পরিচালনায়, তারাই এই নাট্যের পাত্রপাত্রী। নাটকের মহড়া যেমন চলে, জীবননাট্যের নতুন দৃশ্যও তেমনি উন্মোচিত হয়। এই দুই স্তরকে মুনীর চৌধুরী একই সূত্রে গ্রথিত করেছেন এই রচনায়। কাজে ও কথায় আবেগের সংঘাত, বুদ্ধির খেলা, আত্মপ্রতিষ্ঠার সর্ববিধ প্রয়াস এবং অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাব এর প্রাণ। যেমন, যে-নাটকের মহড়া হচ্ছে এই একাঙ্কিকায়, তার নায়িকার ভূমিকায় রোকেয়া দৃপ্তকণ্ঠে বাবাকে বলছে,

আমার বিয়ে আমি ঠিক করব। দিন আমি ঠিক করব। মানুষ আমি বেছে নেবো। আব্বা! আব্বা!

তারপরেই সে কান্নায় ভেঙে পড়ছে---এতটা কান্না কাঁদবার কথা নয় তার নাটকে। তখন বাবার ভূমিকায় অংশগ্রহণকারী তার প্রণয়ী আমিন এত কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলছে,

পারব না। পারব না। এসব কথা আমি কখনই বলতে পারব না।

আমিন : কে বললে পারবে না। অতি চমৎকার করে বলেছ। প্রফেসর হোসেন শুনলে মুগ্ধ হয়ে যেতেন।

রোকেয়া : অভিনয়ে হয়তো পারব। কিন্তু জীবনে পারব না। কোনদিন পারব না। আমি আমার বাবাকে এসব কুৎসিৎ কথা কোনদিন বলতে পারব না।

তারপর

রোকেয়া : পারতাম। যদি উনি নাটকে তোমার মতো চীৎকার করে কথা বলতেন, রাগে গরগর করে উঠতেন---তাহলে সহজেই পারতাম।

আমিন : উনি কি করবেন?

রোকেয়া : আমাকে কাছে টেনে নিয়ে হয়ত খুব আদর করে বলবেন : 'মা একটা ভাল জায়গায় তোমার বিয়ে ঠিক করতে আমার খুব সাধ জেগেছে। তুমি যদি অমত না কর তাহলে আমি কথাবার্তায় এগুই। আর যদি তুমি ইতিমধ্যে অন্য কিছু স্থির করে থাকো, আমাকে বলো। লজ্জা কি মা, বলো।'

আমিন : লজ্জা করবে কেন? অকপটে সব বলবে। তোমার বাবা অতি চমৎকার মানুষ।

রোকেয়া : কি বলব ?

আমিন : কেন, মনে মনে যা স্থির করেছ তাই বলবে।

রোকেয়া : আমি মনে মনে কি স্থির করেছি?

আমিন : আমার কথা বলবে।

রোকেয়া : কেন?

আমিন : কারণ, আমার চিত্তও কেবল তোমাতেই স্থির।

রোকেয়া : এই অমূল্য চিত্ত কিছুদিন আগে জাহানারা আপাকে অর্পণ করেছিলে। ফেরত আনলে কখন?

এই তীক্ষ্ণতা ও এই কথা-কাটাকাটি উৎসারিত হয়েছে পাত্রপাত্রীর পরস্পরের সংঘাত এবং নিজেদের স্বভাবের মধ্যে থেকে। তাতেই নাটক প্রাণ পেয়েছে।

'দণ্ডকারণ্যে'র পশ্চাদভূমিতে রামায়ণ-কাহিনীর অংশবিশেষের যে নবতর প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই, তা আমাদেরকে আনন্দ দেয়। কিন্তু সেই অংশ এবং নাটকের পুরোভাগে বর্ণিত বর্তমানকালের কাহিনী, এই দুই মিলিয়ে তৃপ্তিকর একটা সমগ্রতাবোধ জাগায় না।

তিন

মুনীর চৌধুরীর পূর্ণাঙ্গ নাটক দুটি : 'রক্তাক্ত প্রান্তর' ও 'চিঠি'। এই দুটিও তাঁর স্বভাবের দুই বিপরীতমুখী প্রয়াস। 'রক্তাক্ত প্রান্তর' ট্রাজেডী, 'চিঠি' কমেডী। প্রথমটির পটভূমি পানিপথের মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয়টির ১৯৬২ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। একটির পাত্রপাত্রী রাজ-রাজড়া, অন্যটির ছাত্র-ছাত্রী।

'দণ্ডকারণ্য' একাঙ্কিকার মূলে যেমন ছিল মধুসূদনের প্রেরণা, 'রক্তাক্ত প্রান্তরে'র মূলে তেমনি কায়কোবাদের। নাট্যকার নিজেই বলেছেন যে, কাহিনীর সারাংশ তিনি চয়ন করেছেন 'মহাশ্মশান কাব্য থেকে। অনেকটা এই

সীমাবদ্ধতার জন্যেই আতা খাঁ ও দিলীপের চরিত্র পূর্ণতা লাভ করেনি। কিন্তু যা কায়কোবাদে নেই, তা হল এই নাটকের মুখ্য পাত্রপাত্রীর হৃদয়দ্বন্দ্বের প্রাবল্য আর নাট্যকারের যুদ্ধবিরোধী চেতনা। 'রক্তাক্ত প্রান্তরে'র বিষয়বস্তু মুনীর চৌধুরীর স্বভাবের খুব অনুকূল ছিল না। বর্ণিত যুগের জীবনযাত্রাকে আমাদের গোচরীভূত করার কোন প্রয়াস তিনি করেন নি। বরঞ্চ এই নাটকের মুখ্য চরিত্র সমূহের মধ্যে আধুনিক জীবনচেতনা আরোপ করে যে-সংকটের সৃষ্টি তিনি করেছেন, তা যেমন সে সব চরিত্রকে পূর্ণতা দান করেছে, তেমনি আমাদের কালের দ্বন্দ্বকে প্রকট করেছে। এই দিক দিয়ে 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকে বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের—বিশেষতঃ এই শতকের গতানুগতিক ধারণাকে মুনীর চৌধুরী অনেকখানি বদলে দিয়েছেন, এখানেই তাঁর কৃতিত্ব সর্বাধিক। নকল সিরাজউদ্‌দৌলা ও উদ্ভাবিত গোলাম হোসেনদের উৎপীড়ন থেকে তিনি আমাদেরকে রক্ষা করেছেন। ঐতিহাসিক পাত্র-পাত্রীদেরকে তিনি দূরকালের পটভূমিকায় স্থাপন না করে আমাদের সগোত্র করে তুলেছেন। তাই জোহরা বেগম ও ইব্রাহিম কার্দি এবং জরিনা বেগম ও নজীবদ্দৌলাকে আমরা শুধু ইতিহাসের নায়ক-নায়িকারূপে পাই না, তাদেরকে চিনতে পারি চেনামুখের আদলে।

কারো কারো অভিযোগ, এ-নাটকের পাত্রপাত্রীরা নিজেদের ভাষায় কথা বলে না, বলে মুনীর চৌধুরীর ভাষায়। এ-অভিযোগ সত্য। যেমন:

জরিনা : আপনি অন্ধ। চরিতার্থতা লাভের একটা অলীক মোহে মত্ত হয়ে আপনি আপনার পৌরুষ, আপনার সাহস, আপনার শোভা, আপনার শক্তি, আপনার প্রাণ মাঠে-প্রান্তরে ছড়িয়ে ফেলে দিতে উদ্যত হয়েছেন সেখানে শুধু লাশ, শুধু রক্ত। আপনার দামের কদর সেখানে কে করবে? আমি উষ্ণ, আমি জীবন্ত। কেন আমাকে ত্যাগ করবেন? আমাকে দান করুন। প্রতি কণা ভালোবাসা শতগুণ প্রাণবন্ত করে ফিরিয়ে দেবো। যুদ্ধ পড়ে থাক।

নজীব আমি হয়তো সত্যি অন্ধ। কিন্তু তুমি আমার চেয়ে অন্ধ। এত অন্ধ যে তোমার চরাচর বিলুপ্তকারী ভালোবাসার প্রবলতায় তুমি যে কখন আমার সমগ্র জীবনকেও একটা ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আটক করে রাখতে চাইছো তা তুমি নিজেই জানো না। যদি জানতে তাহলে শিউরে উঠতে। আমার চেহারা চিনতে পারতে না। নবাব নজীবদ্দৌলার যে বিরাট প্রকাণ্ড মূর্তি তোমার ভালোবাসার স্পর্শে আরো বিস্তৃত স্ফীতকায় হয়ে ওঠে সেটাই কুঁকড়ে

কুঁকড়ে এত নগণ্য বিবর্ণ হয়ে যেত যে তখন তুমি তাকে ছুঁতে চাইতে না।

এই উচ্ছ্বসিত ও পুষ্পিত সংলাপ আমাদের প্রতিদিনকার ভাষায় গঠিত নয়, একথা সত্যি এবং সে-সংলাপ আয়ত্ত করতে অভিনেতা-অভিনেত্রীর একটু বিশেষ প্রয়াসের প্রয়োজন, একথাও স্বীকার্য। কিন্তু তা কৃত্রিম শুধু সেই অর্থে, যে-অর্থে নাটকের ভাষামাত্রই কৃত্রিম।

তবু মনে হয়, ট্র্যাজেডী মুনীর চৌধুরীর যথার্থ ক্ষেত্র ছিল না। তিনি কমেডীরই রাজা ছিলেন। আগে তাঁর একাঙ্কিকাগুলোর কথা বলেছি, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নাটক 'চিঠি' তাঁর নাট্যপ্রতিভার উৎকৃষ্ট পরিচয়স্থল। নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা দিতে অধিকাংশ ছাত্রের অসম্মতি ও পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে দেবার দাবীতে আন্দোলনের পটভূমিকায় ভিন্নমত পোষণকারী ছাত্রদের প্রতি বলপ্রয়োগ, ভালো ছাত্রের খাতা হারানো, ছাত্রছাত্রীর প্রণয়ঘটিত দ্বন্দ্ব, প্রক্টরের কর্তব্যপরায়ণতা ও আকস্মিকভাবে পুলিশ অফিসারের উপস্থিতি এ নাটকে প্রহসনের মেলা বসিয়েছে। এর মধ্যে আছে পরীক্ষায় শীর্ষস্থান দখলের প্রতিযোগিতা, ছাত্রীর প্রতি ছাত্রীর গোপন ঈর্ষা, প্রতিপক্ষ ছাত্রকে পুলিশকবলিত করতে চাওয়ার হীনতা, শিক্ষককে নিয়ে কার্টুন-অঙ্কনের আমোদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের প্রচারপত্র-সংগ্রহের হাস্যকর প্রচেষ্টা। ঘটনার জাল রোমহর্ষক উপন্যাসের মতো: ঘটনার এত বাহুল্য তাঁর আর কোন নাটকে নেই। সংলাপরচনার নৈপুণ্যের সঙ্গে চরিত্র সৃষ্টির অপরূপ দক্ষতার সমন্বয় ঘটেছে এ নাটকে। ক্রীড়াবিশারদ খালেদ, শেভিয়ান নায়ক সোহরাব, ছাত্রনেতা রমীজ, নায়িকা মীনা, সহপাঠিনী রুমা, প্রক্টর হাসান ও পুলিশ অফিসার আসাদ—প্রত্যেকেই স্বকীয়তায় উজ্জ্বল।

এই নাটক সম্পর্কে কারো কারো ধারণা এই যে, এতে মুনীর চৌধুরী ছাত্রআন্দোলনকে ব্যঙ্গ করেছেন। পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে দেবার দাবী-যে রীতিমতো একটা আন্দোলনে পরিণত হতে পারে এবং একটা আদর্শভিত্তিক সংগ্রামের তীব্রতা তাতে আরোপিত হতে পারে, এই অসংগতিকেই নাট্যকার শাণিত বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছেন; কিন্তু সে-বিদ্রূপ নির্বিশেষে ছাত্র-আন্দোলন সম্পর্কে নয়। নাটকে ছাত্রসভার দৃশ্যে প্রেসিডেণ্ট রমীজুদ্দীন যখন বলছে,

ছাত্রীবোনদের কাছে আমি করজোড়ে নিবেদন করছি তাঁরা যেন এখন এ সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে যান। এখন ডাইরেক্ট অ্যাকশন শুরু হবে। এমন ডাইরেক্ট অ্যাকশন শুরু হবে যে, তার কাছে বিষাক্ত বস্তু নিক্ষেপ কিছু নয়। (মেয়েরা চলে যেতে শুরু করবে) ভাইসব! আর আমরা বিলম্ব করছি কেন? সব বাতি নিবিয়ে দাও। চিঠি এসে গেছে সংগ্রামের।

আপোসহীন সংগ্রামের। সর্বশেষ সংগ্রামের।

তখন এ বক্তৃতা নাটকের বিশিষ্ট বিষয় ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে। আর তা করলে বোঝা যাবে, 'চিঠি' নাটকে মুনীর চৌধুরীর মৌলিক নাট্যপ্রতিভা কত উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছিল।

চার

মৌলিক নাট্যরচনার মতো তাঁর অনূদিত নাটকগুলোও দুই কোটিতে বিন্যাসের যোগ্য। একদিকে গল্‌সওয়ার্দীর The Silver Box এর বাংলা রূপান্তর 'রূপার কৌটা' অন্যদিকে বার্ণার্ড শয়ের You Never Can Tell এর বাংলা রূপান্তর 'কেউ কিছু বলতে পারে না' এবং শেক্সপীয়রের The Taming of the shrew নাটকের অনুবাদ 'মুখরা রমণী বশীকরণ'। বলা বাহুল্য যে, 'রূপান্তর' গুলোয় যে-স্বাধীনতা তিনি নিয়েছেন, 'অনুবাদে' তা নেন নি।

গল্‌সওয়ার্দীর ভাব ও পক্ষপাতের সঙ্গে মুনীর চৌধুরীর সমাজ-সচেতনতার একটা স্বাভাবিক মিলন ঘটেছিল। শ্রেণীস্বার্থবিভক্ত এই সমাজে বিচার-যে প্রহসনের নামান্তর এবং মানবিক মূল্যবোধ-যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত, এই নাটকে সেই কথাটাই ব্যক্ত হয়েছে। আমাদের দেশের উপযোগী পরিবেশ ও স্বাভাবিক চরিত্র সৃষ্টিতে মুনীর চৌধুরী সহজেই সমর্থ হয়েছেন।

অপর দুটি রচনায় তাঁর ক্রীড়াশীল স্বভাবের উন্মোচন ঘটেছে। শ-য়ের নাটক তাঁর এতই অন্তরঙ্গ যে এর রূপান্তরে তিনি কোন উৎকণ্ঠাবোধ করেন নি। যদিও এই নাটকটিকে দেশী সাজে ঢালা খুব সহজ নয়। যে পরিবারটিকে নিয়ে নাটকের ঘটনাজাল বোনা হয়েছে, সে-পরিবারকে বর্মায় প্রবাসীরূপে উপস্থিত করে তিনি কিছুটা অসুবিধা দূর করেছেন; আর নাটকের শেষে নাচের বদলে ফ্যান্সি ড্রেসের পরিকল্পনা করে কৃত্রিমতার আরেকটা বাধা অতিক্রম করেছেন। সংলাপের চাতুর্য ও বৈদগ্ধ অক্ষুণ্ন রাখতে তাঁকে বেগ পেতে হয়নি।

কিন্তু মুনীর চৌধুরীর জন্যে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা ছিল শেক্‌সপীয়রের অনুবাদ কর্ম। 'রূপার কৌটা'র ভাষা আমাদের প্রচলিত সমাজজীবনের ভাষা—আঞ্চলিক ভাষাও এতে স্থান পেয়েছে। 'কেউ কিছু বলতে পারে না'র ভাষা—চাতুর্য ও বুদ্ধিদীপ্তি সত্ত্বেও আমাদের মুখের ভাষাই। কিন্তু শেক্‌সপীয়রের কাব্যসৌন্দর্য রক্ষা এবং আমাদের কালের সঙ্গে নাটকের কুশীলবদের কালগত ব্যবধান বোঝা-বার জন্যে, দৈনন্দিন জীবনের ভাষা গ্রহণযোগ্য হতে পারত না। 'মুখরা রমণী বশীকরণে'র ভাষা—বিশেষত: শিষ্ট চরিত্রের সংলাপের ভাষা—তাই অপেক্ষা-

কৃত কৃত্রিম ও নিপুণ। অনুবাদক যে বলেছেন, এই নাটকের প্রায় তিন হজার চরণের মধ্যে 'সর্বমোট পনের লাইনের বেশী পারমাণ স্থলে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে মূলের পরিবর্তন করিনি' একথা মিথ্যা নয়। নাটকের রঙ্গ এবং নায়কের নিষ্ঠুরতা এই অনুবাদে বিস্ময়কর বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে।

তিনটি সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির নাটক বাংলায় অনুবাদ করে মুনীর চৌধুরী নিজের অনুবাদক্ষমতা ও নাট্যপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

পাঁচ

সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরী পদার্পণ করেন অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে। প্রধানতঃ শিক্ষকতার অনুপ্রেরণা থেকেই তাঁর প্রথম সমালোচনা-গ্রন্থ 'মীর-মানস' রচিত হয়। মুখ্যত মীর মশাররফ হোসেনের ব্যক্তিগত জীবনের পটে এবং অংশতঃ সেকালের সমাজজীবনের নিরিখে মশাররফ হোসেনের বিশিষ্ট গ্রন্থসমূহের সমালোচনা এতে আছে। আধুনিক জীবনদৃষ্টির সঙ্গে আধুনিক সমালোচনারীতির যোগে যে-বিচার এখানে তিনি করেছেন, স্বচ্ছন্দে তাকে আদর্শস্থানীয় বলা চলে। এই গ্রন্থে, লেখকের সজ্ঞান অভিপ্রায় ছিল 'শিল্পীর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে তাঁর বিচিত্র ভাবনার প্রতিফলনকে লোচন করা এবং তার নানা সংকেতকে অনুসরণ করে শিল্পীর মানস-পরিমণ্ডলের চিত্র রচনা করা।' এই উদ্দেশ্যে তিনি সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে মশাররফ হোসেন সম্পর্কে পূর্ববর্তী সমালোচকদের তথ্যগত ভ্রান্তি ও বিচারগত ত্রুটি যেভাবে তিনি দেখিয়েছেন এবং যেভাবে তিনি পূর্বগামীদের সরল আবেগ ও অপরিমিত উচ্ছাসকে নস্যাৎ করেছেন, তা তাঁর নাটকীয় কৌতুকবোধের সগোত্র। যাঁকে নিয়ে আলোচনা, তাঁর সম্পর্কে এমন আবেগবর্জিত নির্লিপ্ত বিচারের উদাহরণ আমাদের সমালোচনাক্ষেত্রে দুর্লভ বলা যেতে পারে।

মশাররফ হোসেনের দ্বন্দ্বময় সামাজিক সত্তার পরিচয় প্রদান ও তাঁর সাহিত্য প্রয়াসের লঘুগুরুভেদ নির্ণয় এ গ্রন্থে তাঁর প্রধান কৃতিত্ব। দ্বিতীয় কৃতিত্ব, 'বিষাদ সিন্ধুর পুনর্বিচার'। অসাধারণ মর্মরসজ্ঞতার সঙ্গে 'বিষাদ-সিন্ধু'র—বিশেষত: এজিদ ও জায়েদা-চরিত্রের —বিশ্লেষণ মুনীর চৌধুরীর সমালোচনাশক্তির উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত-স্থল। এই গ্রন্থে তাঁর তৃতীয় কৃতিত্ব, তুলনামূলক সমালোচনাপদ্ধতির প্রয়োগ। মশাররফ হোসেনের 'আমার জীবনী' গ্রন্থকে উপলক্ষ করে বাংলা আত্মজীবনী সাহিত্যের যে-তুলনামূলক বিচার তিনি করেছেন, তা এক্ষেত্রে প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বলে বিবেচিত হবে।

তুলনায় সমালোচনার এই পদ্ধতি-প্রয়োগের বিস্তৃততর ক্ষেত্র রচিত হয়েছে তাঁর 'তুলনামূলক সমালোচনা' গ্রন্থে। অপরপক্ষে, বাংলা সাহিত্যের আরো বড় শিল্পীদের সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশিত সমালোচনাও এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে তুলনামূলক সমালোচনার দুটি রীতি তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। দুটি সাহিত্যের দুজন রচয়িতার মিল-অমিলের আলোচনা একদিকে; অন্যদিকে এক বা একাধিক ভাষার একাধিক লেখকের একই ধরনের চরিত্রের সমালোচনার মাধ্যমে তাঁদের মানসিকতা ও রুচির পরিচয় প্রদান।

'জঁা রাসিন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধদুটিতে মুনীর চৌধুরীর সিদ্ধান্ত আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন তথ্য সংযোজনা করেছে। এতকাল বিবেচনা করা হত যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৌলিক নাটক অন্তত: চারটি। কিন্তু মুনীর চৌধুরী দেখালেন, যে, এই চারটির মধ্যে অন্তত: 'পুরুবিক্রম' ও 'সরোজিনী' নাটকের সূচনাটুকু শুধু মৌলিক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক থেকে যবনিকা পর্যন্ত রাসিনের অনুবাদ। 'পুরুবিক্রমে'র মূল Alexandre (Aleaner the great) এবং 'সরোজিনীর' মূল Iphigenic (Iphigenia)। (এই অনুবাদের প্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে তিনি রাসিনের ইংরেজি ভাষান্তরের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের তুলনা করেছেন চরণ ও পংক্তি ধরে। যেখানে বাঙালী নাট্যকার নতুন কোন কথা যোগ করেছেন, সেখানে—মুনীর চৌধুরী দেখিয়েছেন—তিনি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বশ্যতা স্বীকার করেছেন। সমালোচনাক্ষেত্রে অসাধারণ পরিশ্রম স্বীকার ও বিচারবুদ্ধির উজ্জ্বল স্বকীয়তার অপূর্ব মিলন এখানে লেখক ঘটিয়েছেন।

অনুরূপভাবে 'মাইকেল ও সেক্সপীয়ার' প্রবন্ধে মুনীর চৌধুরী এই সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে গ্রীক প্রভাব সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস অলীক কিংবদন্তী মাত্র; কর্নেল টডের কাছেও মাইকেল মধুসূদন সামান্য ঋণী। মধুসূদনের অনুপ্রেরণার উৎস আসলে শেক্সপীয়ার—যদিও শেক্সপীয়র সম্পর্কে নাট্যকারের স্বীকারোক্তি অনেক সময়ে আমাদেরকে অভ্রান্ত উৎসের দিকে চালিত করে না।

'তুলনামূলক সমালোচনা' গ্রন্থের অন্য দুটি প্রবন্ধে মুনীর চৌধুরী দেখিয়েছেন যে, একই ঐতিহাসিক চরিত্র কিভাবে উদ্দেশ্য ও রুচিভেদে ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার হাতে রূপান্তরিত হয়। ড্রাইডেন, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদ প্রসাদের আওরঙ্গজেব-চরিত্র একটি প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়; অপরটির বিষয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটি, দ্বিজেন্দ্রলালের তিনটি ও ক্ষীরোদপ্রসাদের একটি নাটকে মহাবৎ খাঁ বা মহীপৎ সিংহের ভূমিকা। শুধু চরিত্রসমূহের পরিবর্তনের

বর্ণনায় নয়, তার সামাজিক ও শিল্পগত কারণের বিস্তৃত ব্যাখ্যাদানে এই তুলনামূলক বিচার সমৃদ্ধ। 'তুলনামূলক সমালোচনা' গ্রন্থটি তাই শুধু মুনীর চৌধুরীর নয়, বরঞ্চ আমাদের দেশের একটি শ্রেষ্ঠ সমালোচনাগ্রন্থরূপে বিবেচিত হবে।

তাঁর অপর গ্রন্থ 'বাংলা গদ্যরীতি' বাংলা গদ্যের ধারাবাহিক ইতিহাস নয়। পূর্ব বাংলার সাহিত্যে গদ্যের প্রকৃতিপরীক্ষা এ-রচনার একটি উদ্দেশ্য। তবে বিশেষভাবে যা তাঁর বিবেচনাধীন, তা ছিল পূর্ব বাংলায় বাংলা লিপি, বানান ও গদ্যরীতির সজ্ঞান পরিবর্তন-প্রয়াসের আলোচনা।

সূচনায় মুনীর চৌধুরী দেখিয়েছেন যে, বাংলা গদ্যের একাধিক রীতি সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিকদের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছে। বিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত মুসলমান লেখকেরাও এ-নিয়মের বশীভূত ছিলেন। চতুর্থ পঞ্চম দশকে নিজেদের সৃষ্ট সাহিত্যকর্মের স্বাতন্ত্র্য সন্ধান করতে যেয়ে কিছুসংখ্যক মুসলমান লেখক 'হিন্দু ঐতিহ্যাশ্রয়ী' ও 'সংস্কৃতানুযায়ী' বাংলা গদ্যরীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। সে-বিরুদ্ধাচরণ শুধু মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি নয়, মশাররফ হোসেন ও মোজাম্মেল হক, নজীবর রহমান ও ইসমাইল হোসেন সিরাজীর গদ্যরীতির প্রতিও। পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে এই জেহাদী মনোবৃত্তি প্রবল হয়।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন যে, সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে—যা ভাষা বা রীতি-পরিবর্তনের একমাত্র মাধ্যম—এই মনোভাব তেমনভাবে প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের লেখকদের গদ্য রচনায় ব্যবহৃত, অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত শব্দের একটি নমুনামূলক তালিকা মুনীর চৌধুরী এই গ্রন্থে সংকলন করেছেন। আর সেইসঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে, পূর্ব বাংলায় তিনটি বিশিষ্ট রীতির গদ্য বিকশিত হয়েছে। একদিকে রয়েছে আঞ্চলিক শব্দব্যবহারের প্রয়াস, যদিও এসব লেখকদের 'আঞ্চলিকতা এঁদের রচনার মুখ্য আকর্ষণ নয়, গ্রাম্যতাও এঁদের স্বভাবের মুখ্য বৈশিষ্ট্য নয়'' এবং এঁদের মানসপ্রকৃতি 'সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার সঙ্গে মননশীল নাগরিকতায় গঠিত'। দ্বিতীয় স্তরে আরবী-ফারসী শব্দপ্রয়োগের যে-প্রবণতা দেখা যায়, 'বিজ্ঞ ক্রীড়াপরায়ণতা' অর্থাৎ রঙ্গব্যঙ্গের অনুরোধই তার উল্লেখযোগ্য দিক। 'বয়সে তরুণ এবং স্বভাবে অনাস্থাবাদী' লেখকেরা বিশ্বনাগরিকতাবোধ ও স্বাতন্ত্র্যাভিলাষ থেকে তৃতীয় রীতির বিকাশ ঘটিয়েছেন। সেখানে আভিধানিক শব্দের বাহুল্য, ব্যাকরণের কঠিন নিয়মে পদগঠন এবং জটিল ও দীর্ঘসূত্র বাক্যের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাবে।

এ-সত্ত্বেও পূর্ব বাংলায় পণ্ডিত-অপণ্ডিত নির্বিশেষে এক ধরনের লোক এক ও অবিভাজ্য আদর্শ গদ্যরীতির ব্যবস্থাদান এবং ব্যাকরণ, বর্ণমালা ও বানান-

সংস্কারের প্রস্তাব ক্রমাগত করে এসেছেন। এসব সংস্কার-প্রস্তাবের পক্ষে কখনও জাতীয়তাবোধ, কখনও ধর্মীয় ঐতিহ্য, কখনও বিজ্ঞানের দোহাই দেওয়া হয়েছে। এসব প্রয়াসের হাস্যকরতা যেমন তাঁর সরস ও বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গির কৌশলে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তেমনি তার অন্তঃসারশূন্যতা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ভাষাবিজ্ঞানীর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণশক্তিতে। সরলীকরণের নামে বাংলা ভাষার প্রকৃতিবদলের প্রচেষ্টাকে রোধ করতে চেয়ে এই গ্রন্থে মুনীর চৌধুরী যেমন সামাজিক ভূমিকা পালন করেছেন, তেমনি এখানকার সাহিত্যকর্মের অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণ করে সমালোচনার ক্ষেত্রেও পথপ্রদর্শন করেছেন।

ছয়

কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তাঁর এরকম প্রবন্ধের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য হল চার্লস ফার্গুসন-সহযোগে লিখিত ও Language পত্রিকায় (জানুয়ারী—মার্চ ১৯৬০) প্রকাশিত 'The Phonemes of Bengali', International Journal of American Linguistic পত্রিকায় প্রকাশিত (জুলাই ১৯৬০) 'The Language problem in East Pakistan' এবং বাংলা একাডেমী পত্রিকায় প্রকাশিত (মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯) 'সাহিত্য, সংখ্যাতত্ত্ব ভাষাতত্ত্ব'। ভাষাবিজ্ঞানে তাঁর অনুরাগ ও অধিকারের পরিচয় এবং প্রকাশভঙ্গির অনন্য মাধুর্য এসব রচনায় দেদীপ্যমান। বাংলা টাইপরাইটারের নতুন কী-বোর্ড পরিকল্পনা করে যে পুস্তিকাটি তিনি রচনা করেন (Bengali Typewriter), তাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। একটি বর্ণনামূলক বাংলা ব্যাকরণরচনার পরিকল্পনা তাঁর ছিল অনেকদিন ধরে। কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, তা ঠিক বলতে পারব না।

'মর্মান্তিক' নামে তাঁর একটি ছন্দোবদ্ধ কৌতুকনাট্য পত্রিকায় প্রকাশ পেয়ে-ছিল। 'চিঠি'র মতো এরও উপজীব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনযাত্রা। এর বিষয়বস্তু অত উজ্জ্বল নয় এবং ছন্দও তাঁর উপযুক্ত বাহন নয়। স্ট্রিণ্ডবার্গের The Father নাটকের চমৎকার অনুবাদ 'জনক'ও পত্রস্থ হয়েছিল। শেষকালে তিনি অনুবাদ করছিলেন শেক্সপীয়রের 'ওথেলো'। চট্টগ্রাম বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শেষবারের মতো যখন তিনি আসেন ১৯৭১-এর গোড়ার দিকে, তখন এর অনেকখানি অংশ পড়ে শুনিয়ে শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করেছিলেন। সম্ভবতঃ এটির অনুবাদও সম্পূর্ণ হয়নি। আর হবেও না কোনদিন।

আর তিনি আমাদেরকে উপহার দেবেন না মনোমুগ্ধকর নাটক, কি পাণ্ডিত্য পূর্ণ প্রবন্ধ। তাঁর হৃদয়োন্মাদকর বক্তৃতা আর শুনতে পারব না আমরা।

আমাদের চিত্তে শূন্যতার স্থায়ী উপলব্ধিকে গভীরতাদান করে তিনি হারিয়ে গেলেন, ফুরিয়ে গেলেন। ট্রাজেডী যাঁর স্বভাবের অনুকূল ছিল না, সেই মানুষটি শেষ পর্যন্ত হৃদয়বিদারক ট্রাজেডীর মহানায়ক। আমার আজকের উপলব্ধিই কি তিনি এমনি করে লিখে রেখে গেছেন নিজের নাটকে:

> তুমি কেন সাড়া দিলে না? কেন জেগে উঠলে না? কেন ঘুমিয়ে পড়লে? আমি এত কষ্টের আগুনে পুড়ে, মনের বিষে জরজর হয়ে এত রক্তের তপ্তস্রোত সাতরে পার হয়ে তোমাকে পাবার জন্যে ছুটে এলাম— আর তুমি কিনা ঘুমিয়ে পড়লে! ঘুমের কোন্ অতল তলে ডুবে রইলে যে আমি এত চীৎকার করে ডাকলাম তবু তুমি একবারও শুনতে পেলে না! আহা! ঘুমোও! আমি তোমাকে জাগাবো না। তোমার মুখ দেখে আমি বুঝেছি অনেকদিন ধরে তুমি ঘুমোও নি। চোখের দু'পাতা মুদে মনের আগুনের লকলকে শিখাকে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও আড়ালে ঠেলে দিতে পারো নি। কষ্ট, ঘুমের বড় কষ্টে ভুগেছো তুমি। ঘুমাও! আরো ঘুমাও! প্রাণ ভরে ঘুমাও!

পরিশিষ্ট

মুনীর চৌধুরীর জীবনপঞ্জী

জন্ম	ডিসেম্বর ১৯২৫। মানিকগঞ্জ, ঢাকা।
শিক্ষা	ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র হিসেবে ঢাকা বোর্ড থেকে ম্যাট্রিক ১৯৪১, প্রথম বিভাগ। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই. এস সি. ১৯৪৩, দ্বিতীয় বিভাগ। সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের ছাত্র হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে বি. এ. (অনার্স), ১৯৪৬, ও এম. এ. ১৯৪৭, উভয় পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণী। নিরাপত্তা বন্দী হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম. এ. প্রথম পর্ব ১৯৫৩ ও দ্বিতীয় পর্ব ১৯৫৪, উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে এম. এ. ১৯৫৮।
কর্মজীবন	দৌলতপুরের (খুলনা) ব্রজলাল কলেজে ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ১৯৪৯—৫০। ঢাকার জগন্নাথ কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক, ১৯৫০। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগে লেকচারার, ১৯৫০-৫২ ও ১৯৫৪-৫৫; বাণিজ্য বিভাগে খণ্ড-কাল ইংরেজির অধ্যাপনা, ১৯৫০-৫১; বাংলা বিভাগে খণ্ড-কাল অধ্যাপনা, ১৯৫৫। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে লেকচারার, ১৯৫৫-৬২; রীডার ১৯৬২-৭০; প্রফেসর ১৯৭০-৭১। বাংলা বিভাগের প্রধান, ১৯৬৮-৬৯; ১৯৬৯-৭১। কলা অনুষদের ডীন, ১৯৭১।
কারাবরণ	১৯৪৮; ১৯৫২-৫৪; ১৯৫৪-৫৫। চান্সেলর ও সামরিক শাসনকর্তার সতর্কবাণী, ১৯৭১।
বিদেশ-ভ্রমণ	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৫৬-৫৮; ১৯৭০। যুক্তরাজ্য, ১৯৫৬, ১৯৫৮, ১৯৭০। টোকিওতে ইউনেসকো কর্তৃক আয়োজিত

নাট্যোৎসবে যোগদান, ১৯৬৩। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ১৯৬৪। পশ্চিম জার্মানী, ১৯৬৭। পূর্ব জার্মানী ১৯৬৭, ১৯৬৮।

সাহিত্য-পুরস্কার বাংলা একাডেমীর নাট্য-পুরস্কার, ১৯৬২; দাউদ পুরস্কার, ১৯৬৫। ১৯৬৬তে লব্ধ সিতারা-ই-ইমতিয়াজ খেতাব বর্জন, মার্চ ১৯৭১।

স্বজন পিতা মরহুম খান বাহাদুর আবদুল হালিম চৌধুরী, এককালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। অনুজা নাদিরা বেগম, এককালে রাজনৈতিক কর্মী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা। স্ত্রী লিলি মীর্জা মঞ্চ, টেলিভিশন ও বেতারের অভিনেত্রী। সন্তান ভাষণ (আহমদ মুনীর), স্থাপত্যের ছাত্র; মিশুক, ইস্কুলের ছাত্র; তন্ময়, সর্বকনিষ্ঠ।

মনীর চৌধুরীর গ্রন্থপঞ্জী

নাটক

১. 'রক্তাক্ত প্রান্তর' (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬২; পঞ্চম মুদ্রণ; ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৯)। পৃ ১২+৭৬। দু টাকা। উৎসর্গ 'আমার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ/ লিলির নামে/ উৎসর্গ: করলাম।'

২. 'চিঠি' (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৬)। পৃ ৪+১১৬। দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

৩. 'কবর' (চট্টগ্রাম: শাহীন বুক ক্লাব, ১৯৬৬)। পৃ ৮+৮৮। দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা। সূচী: 'মানুষ', 'নষ্ট ছেলে', 'কবর'। 'উৎসর্গ' নাদেরা বেগমকে'।

৪. 'দণ্ডকারণ্য (চট্টগ্রাম: শাহীন বুক ক্লাব, ১৯৬৬)। পৃ ৮+১১৮ দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা। সূচী: 'দণ্ড', 'দণ্ডধর', 'দণ্ডকারণ্য'। উৎসর্গ: 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের / ছাত্র-ছাত্রীদের কোমল-কঠিন করে'।

৫. 'পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য' (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৬৯)। পৃ ১৩৪। তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা। সূচী: 'পলাশী ব্যারাক',

'ফিট কলাম', 'আপনি কে', 'একতালা দোতালা', 'মিলিটারী', 'বংশধর'। 'উৎসর্গ': 'আমার নাট্যামোদিনী তিন ভগিনী / ফিরদৌস, বানু ও রাহেলাকে'।

অনুবাদ নাটক

১. 'কেউ কিছু বলতে পারে না' (ঢাকা : বাঙলা একাডেমী, ১৯৬৭)। পৃ ৮+১৮৪। তিন টাকা পঁচাত্তর পয়সা। 'উৎসর্গ / আমার নাটকের / দুইজন উৎফুল্ল ও উচ্ছ্বসিত গ্রহীতা / ডক্টর আনিসুজ্জামান ও সিদ্দিকা জামানকে'।

২. 'রূপার কৌটা' (ঢাকা : বাঙলা একাডেমী, ১৯৬৯)। পৃ ৮+১০২। তিন টাকা। উৎসর্গ: 'এই নাটকের / প্রথম রজনীর নিপুণ শিল্পী / রাশেদা জামান ডলিকে'।

৩. 'মুখরা রমণী বশীকরণ' (ঢাকা : পাকিস্তান লেখক সংঘ, ১৯৭০)। পৃ ২৬+১০২। তিন টাকা। উৎসর্গ: 'মৃদুভাষিণী চারু-হাসিনী পতিভাবিনী/ শ্যালিকা ফরিদা নাসির লাভুকে/ মুখরা রমণী বশীকরণ উপহৃত হল।'

প্রবন্ধ গ্রন্থ

১. 'মীর-মানস' (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৫)। পৃ ৮+২৩৬। পাঁচ টাকা। উৎসর্গ: 'আমার শিক্ষক, সংশোধক এবং অনু-প্রাণক / ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক / শ্রদ্ধাভাজনেষু'। (দ্বিতীয় মুদ্রণ; ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৯)। এই মুদ্রণে ভূমিকা : উৎসর্গ বর্জিত।

২. 'তুলনামূলক সমালোচনা' (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৯)। পৃ ৮+২৭৮। সাত টাকা। 'উৎসর্গ / অগ্রজ প্রতিম সৈয়দ আলী আহসানকে/যিনি আমাদের মধ্যে প্রথম/গভীর অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন বৈদগ্ধপূর্ণ সাহিত্য-সমালোচনার / অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করে/অনুরূপ অনুশীলন-অনুসন্ধানে ব্রতী হবার জন্য/আমাকে অনুপ্রাণিত করেন।'

৩. 'বাঙলা গদ্যরীতি' (ঢাকা : কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ১৯৭০)। পৃ ৬+২০২। পাঁচ টাকা।

তাঁর নাটকের অনুবাদ

THREE PLAYS (Dacca : Bengali Academy, 1972), pp 12+78. Rs. 8.00। 'কবর' একাঙ্কিকাসংগ্রহের কবীর চৌধুরীকৃত অনুবাদ।

বিবিধ

১. An Illustrated Brochure on Bengali Typewriter (Dacca : Central Board for Development of Bengali, 1965). pp 24+plates. Foreword by (Dr.) Muhammad Enamul Haq.

২. 'খড়ম' (গল্প), রুহুল আমিন নিজামী-সম্পাদিত 'পূর্ব বাংলার সেরা গল্প' (কলিকাতা : ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, ১৯৫৩)। 'মানুষের জন্য' (গল্প), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত 'গল্পসংগ্রহ' (দ্বি-স ; ঢাকা ১৯৬৬)।

৩. পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম বর্তমান প্রবন্ধের শেষভাগে করা হয়েছে। এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর ও বাবলী হক-সম্পাদিত 'পারাপার' সংকলনে (ঢাকা, ১৯৭১) আলী ইমাম-গৃহীত বিশেষ সাক্ষাৎকার এবং দৈনিক 'আজাদে' আ. ন. ম. গোলাম মোস্তফা-গৃহীত সাক্ষাৎকার।

৪. 'খড়ম' গল্পের রাজিয়া খান কৃত ইংরেজি অনুবাদ 'The wooden Sandals' সংকলিত হয়েছে Under the Green Canopy (Lahore Afro Asian Book Club, 1966) গ্রন্থে। 'দণ্ডধর' একাঙ্কিকার রওশন জাহানকৃত ইংরেজি অনুবাদ The Rehearsal পাকিস্তান অ্যাসোসিয়েশন অফ শিকাগো কর্তৃক প্রচারিত ও মঞ্চস্থ হয় (শিকাগো, ১৯৬৫)।

মুনীর চৌধুরী : সাহিত্যকর্ম
সভাপতির ভাষণ

সৈয়দ আলী আহসান

মুনীর চৌধুরীর সাহিত্য কর্মের উপর ডঃ আনিসুজ্জামানের প্রবন্ধটি সুলিখিত। মুনীর চৌধুরীর নাটক এবং প্রবন্ধ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। ছোটগল্প নিয়ে তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে। বোধ হয় সাময়িক পত্রে গল্পগুলি থাকাতে ব্যাপক আলোচনা হয়নি। গল্পের আলোচনার প্রয়োজন ছিল। মুনীর চৌধুরীর নাটকের প্রতি উৎসাহ অসীম। বিদেশী নাটক পাঠ করে তিনি মর্মউপলব্ধি করতেন। নাট্যকার মুনীর চৌধুরী সংলাপের তীক্ষ্ণতার মাধ্যমে নাট্য চরিত্র বিশ্লেষণ করতেন। 'টি. এস. ইলিয়ট শেক্সপীয়রের নাটকের বাণী সম্পর্কে বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সিজারের মৃত্যু দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন, অর্থাৎ সংলাপের বাচন ভঙ্গিতে উপলক্ষ করা যায় সিজারের নিষ্ঠুর মৃত্যু অদৃশ্য অস্ত্রের অপেক্ষামাত্র।' অর্থাৎ ইলিয়াট সংলাপের বাণীর উপর জোর দিয়েছেন। বাঙলা নাটকের সংলাপ শুনে চরিত্রের গতি প্রকৃতি নির্ণয় অসম্ভব। এক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরীর ব্যতিক্রম। মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তরে' সমগ্র চরিত্র সংলাপনির্ভর।

জনাব কবীর চৌধুরী মুনীর চৌধুরীর নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করেছেন। এ নাটক বিদেশী যে কোন নাটকের সঙ্গে তুলনীয়। বেঁচে থাকলে মুনীর চৌধুরী আরো নতুন ধরনের নাটক রচনা করতে পারতেন। মুনীর চৌধুরী নাট্য প্রতিভা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে অগ্রসর হয়েছে। তাই কোন নাটকই চূড়ান্ত নয়। সমালোচনা সাহিত্যে মুনীর চৌধুরী কতিপয় নব নব তথ্য দিয়েছেন। তাই তুলনামূলক সমালোচনা গ্রন্থে লক্ষ্য করি তাঁর গবেষণার দক্ষতা বিদেশী সাহিত্য পঠন পাঠনের গভীরতা। তিনিই প্রথম নির্ণয় করেছেন জ্যোতি-রিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৌলিক সৃষ্টি অনুকৃত রচনার তুলনায় সংকীর্ণ।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর জীবনকথা

সন্‌জীদা খাতুন

একুশে মার্চ মঙ্গলবার বিকাল চারটা

মানুষের জীবনের যাবতীয় ঘটনা বিচিত্র রঙের সুতার মত নানা টানাপোড়েনে সমগ্র জীবনের বিস্তীর্ণ নক্সী চাদরটিকে বুনে তোলে। বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে গেলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলিকে তুচ্ছ মনে হওয়া অসম্ভব নয়। অথচ এইসব ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনাবলী বিভিন্ন ইঙ্গিত বহন করে, জীবনকে নানা অর্থ আভাসিত করে। এই সত্য স্মরণ রেখে আমরা বলতে পারি, জন্ম-মৃত্যু এবং জীবনক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জনাদি বিশেষ বিশেষ কয়েকটি ঘটনার সমাবেশ মাত্রে জীবন গঠিত নয়, যাবতীয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ঘটনার সমন্বয়েই তার সম্পূর্ণতা।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর চরিত কথা বলতে গিয়ে বড় ঘটনাগুলির পাশে গুরুত্বের পরিমাণ একান্ত স্পষ্ট হয়ে উঠবে জেনে, আরম্ভে এই কথার অবতারণা করলাম।

কথায় বলে, মানুষ তার পরিবেশের সন্তান। প্রকৃতিগত কিছু গুণ বিশেষ পরিবেশের পরিচর্যায় অবশেষে হয়ে ওঠে একটি মানবজীবন। জীবনের প্রথমে মাতাপিতার কাছ থেকে পাওয়া স্বভাবগত কিছু সম্বল নিয়েই মানব যাত্রার শুরু। ১৯২৭ সালে যাত্রার শুরুতে মোফাজ্জল হায়দার যে-মায়ের কোল পেয়েছিলেন, তিনি ছিলেন গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া-করা-মেয়ে মাহ্‌ফুজা খাতুন। বাংলার উপর অধিকার ছিল এঁর দৃঢ়। সেই আমলের গ্রাম্য মুসলমান নারী হলেও 'আনোয়ারা', 'মনোয়ারা', 'বিষাদসিন্ধু', শরৎচন্দ্র পড়েছিলেন তিনি। সুর করে পুঁথি পড়তে জানতেন। মুখস্ত করবার ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ। শোনা যায় বিবাহের পর পিতৃগৃহের জন্য কাতর হয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে পদ্যে চিঠি লিখেছিলেন ইনি। মোফাজ্জল হায়দার—মায়ের আদরের ধন 'সানু'র বাংলা পাঠের হাতে খড়ি এই মাতার কাছে। পরবর্তী কালে প্রবাসী ছাত্র মোফাজ্জলের তত্ত্বাবধানের জন্য মাহফুজা খাতুন শান্তিনিকেতন শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ অনিল

কুমার চন্দের সঙ্গে পত্রালাপ করতেন। পুত্রদের কাছে পত্র দিতে নামোল্লেখ না করে পাঠ দিতেন 'শ্রীমান' বলে। এতে তাঁর মর্যাদাবোধ অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়।

মোফাজ্জল হায়দারের পিতা বজলুর রহিম চৌধুরী ছিলেন কৃতী ছাত্র। ইনি নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার খালিসপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত মিয়া পরিবারের সন্তান। 'রঙীন আখর' গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে মোফাজ্জল হায়দার পিতাকে 'সাহিত্যরসিক' ব'লে উল্লেখ করেছেন। বজলুর রহিম প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দিয়ে কৃতিত্বের জন্য পদক উপহার পেয়েছিলেন। নিজে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশের পর উচ্চশিক্ষার দিকে না গেলেও পরিবারের মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার সুবিধার জন্য ইনি আপন গৃহের সন্নিকটে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। লেখাপড়ার চর্চায় তাঁর প্রবল উৎসাহ ছিল। বসতবাটী থেকে দু'মাইল দূরে অবস্থিত ছয়আনি স্কুলটির সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই স্কুলের একটি সভায় সভাপতিত্ব ক'রে ফিরে এসেই ইনি সান্নিপাতিক জ্বরে শেষ শয্যা গ্রহণ করেন।

মিয়া পরিবারের বংশধর হয়েও নয় বৎসর বয়সে পিতাকে হারিয়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র মোফাজ্জল হায়দার—বাবার পরম স্নেহের সাহেব মিয়া অকূলে ভাসলেন। স্নেহময় পিতামহ তখনও জীবিত। কিন্তু বিরোধী পক্ষীয় জ্ঞাতিদের ভয়ে তিনি দুর্বল। ফলে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হল। মাতা মাহফুজা খাতুন দেখলেন এই পরিবেশে বাস করলে তাঁর তিন পুত্র ও এক কন্যার ভবিষ্যৎ একেবারে অনিশ্চিত হয়ে যাবে। মোফাজ্জলকে তিনি বিদ্যাভ্যাসের জন্য মাতুলের সঙ্গে রামগঞ্জ স্কুলের হেডমাষ্টার, খালু ইউনুস মিয়ার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এবং একদিন নিশাযোগে অন্য সন্তানদের নিয়ে পিত্রালয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে শুরু হ'ল উত্তরাধিকারের মামলা। মোকদ্দমার সময়টা মাহফুজা খাতুন পিতার আশ্রয়ে কাটিয়ে পরে আবার স্বামীর ভিটায় ফিরে যান। মোকদ্দমাকালের জটিল ঘটনাচক্রের মধ্যে আমাদের প্রবেশ না করাই ভালো। জ্যেষ্ঠপুত্রকে এর আঁচ থেকে কিছু পরিমাণে দূরে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা মাতা করেছিলেন। মাতুল গোলাম হোসেন নিজে তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। কিন্তু সেই বয়সেই প্রচুর ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার ক'রেও তিনি ভাগিনেয়ের স্কুল শিক্ষার ভিত্তিটি পাকা ক'রে দেন। স্পর্শকাতর মনের কল্পনাপ্রবণ শিশুটিকে এই কঠিন বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়তো কিছুটা আড়াল করতে পেরেছিলেন মা। হায়দার আপন শৈশবের বর্ণনায় লিখেছেন—

'যে-আনন্দে আমার শৈশবের এবং কৈশোরের দিনগুলি মধুময় হয়ে উঠেছিল,

তার কথা বুঝি বলে কিছুতেই বোঝাতে পারবনা। এখনও আমার মনে পড়ে চার পাঁচ বছর বয়সের কথা। দ্বিপ্রহরের অবসর সময় মা আমায় শুইয়ে রাখতেন বাইরে যেন দুষ্টুমি করতে যেতে না পারি। ঘরের বারান্দায় চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে চেয়ে থাকতাম আকাশের দিকে। নীল স্বচ্ছ আকাশের ওপর দিয়ে সাদা সাদা মেঘ ভেসে চলে যেত। আমার মনে হত এরাও একরকম প্রাণী, কিংবা বুঝিবা মেঘরাজ্যের শিশু, গল্প করতে করতে কিংবা কথা বলতে বলতে, ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। কখনও মনে হত সাদা সাদা মেঘগুলি বুঝি ভেড়ার পাল, আকাশের বুকে দল বেঁধে চরতে বেরিয়েছে। নির্জন দুপুরের শান্ত আকাশের সেই অলস মেঘগুলির সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্ষুদ্র শিশু চিত্তখানিও উড়ে চলে যেত কোন সুদূরে যেন পাড়ি দিতে। ঘুমুতে ঘুমুতে স্বপ্ন দেখতাম, আমি সে মেঘের রাজ্যে পৌঁছে গেছি। সেখানে বেগুনী, নীল আর গোলাপী রঙের কী অপূর্ব সমারোহ। হঠাৎ ঘুম টুটে গিয়ে মনে হত, এই আকাশ, এই মেঘ---এই সমস্ত বাইরেটাই বুঝি স্বপ্ন। বহুদূর থেকে শুনতাম চিলের দীর্ঘ বাঁশির মতো ডাক, তাকে মনে হত অজানা দূরের হয়তো বা সেই স্বপ্ন লোকের বাঁশি। এই আমার শৈশবের প্রথম স্মৃতি।'[১]

উত্তরাধিকারের মামলায় জয়লাভের পর, বীমাসূত্রে কিছু অর্থপ্রাপ্তি ঘটল। এই বীমার অর্থেই পিতৃহীন মোফাজ্জল হায়দার বহুদূর পর্যন্ত নিশ্চিন্তভাবে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। মাতার বুদ্ধিমত্তা ও ঐকান্তিক আগ্রহেই ভাগ্যের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত পুত্রের মানুষ হয়ে উঠবার পথ সুগম হয়।

স্কুল জীবনের অধিক অংশই কাটে নোয়াখালীর আহ্‌মদিয়া হাই স্কুলে। বাৎসরিক পরীক্ষায় সমস্ত বিষয়ে বিশেষতঃ বাংলা ও ইংরেজীতে তার নম্বর সকলের প্রশংসা অর্জন করত। সেই সময়ে জনশিক্ষা বিভাগীয় সহকারী পরিচালক খান বাহাদুর বদিউর রহমান একবার স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে মোফাজ্জল হায়দারের পরীক্ষার ফল দেখে তুষ্ট হয়ে তাঁকে জলপানি দেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রী বারীন্দ্রচন্দ্র কর এবং জনাব মুবারক আলী এই ছাত্রের গুণে মুগ্ধ হ'য়ে তার সর্বাত্মক উন্নতির দিকে সচেতন দৃষ্টি রেখেছিলেন। ইংরেজি এবং বাংলায় ব্যুৎপত্তির জন্য জেলার মধ্যে তাঁর নাম প্রচার হয়ে পড়েছিল। এই সময় থেকেই তাঁর সাহিত্য রচনার বিশেষতঃ গল্প ও কবিতা রচনার শুরু। তখন থেকেই রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহ হয়ে উঠে প্রবল। বড় হয়ে লেখা তাঁর স্কুল জীবনের একটি বিবরণ এইরকম---

---

১ লেখার উৎস, রঙীন আখর পৃঃ ৪১—৪২

'ছোটবেলায় আমি যখন স্কুলে পড়তুম তখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়বার আমার বিশেষ সুযোগ ছিলনা। প্রথমত আমি জন্মেছিলাম কিছুটা সেকেলে গোঁড়া একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে। দ্বিতীয়ত, আমি যে স্কুলগুলিতে পড়েছিলাম সেগুলিও ছিল নিতান্ত সেকেলে অনগ্রসর ধরণের। কোনো কোনো স্কুলে ঠিক-মতো একটা লাইব্রেরী পর্যন্ত ছিলনা। তবু কবির ছিটেফোঁটা কবিতা বা গল্প দু'একটা যা হাতে এসে পড়তো—তাই মনের মধ্যে কল্পনার আর সুরের কী এক অপূর্ব মায়াজাল রচনা করতে থাকতো।'[১]

সাহিত্যের পাশে ছিল চিত্রশিল্পের প্রতি অনুরাগ। স্বপ্নের সেই বেগুনী, গোলাপী আর নীল রঙ নিয়ে তুলির খেলায় তাঁর মন স্ফূর্তি পেত। পরবর্তী জীবনে শান্তিনিকেতনে ছাত্র অবস্থায় তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, যামিনী রায়, মুকুল দে, সুরেন্দ্রনাথ কর প্রভৃতি শিল্পীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। এইসব শিল্পীদের স্নেহোপহার হিসেবে কিছু চিত্রও আছে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে। আরও পরে চাকুরী জীবনে ঢাকাতে শিল্পী জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান, শফিউদ্দীন আহমদ প্রভৃতির সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ হন।

১৯৪২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার ক'রে মোফাজ্জল প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে তাঁর বিদ্যালয় শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯৪২ যুদ্ধের বৎসর। কলকাতা নগরী এই সময়ে জাপানী বোমার ভয়ে সন্ত্রস্ত। উক্ত বৎসরের মেধাবী ছাত্রদের অধিকাংশ তাই কলকাতা না গিয়ে ঢাকার সরকারী কলেজে ভর্তি হয়। ঢাকা কলেজে মোফাজ্জল হায়দার প্রসিদ্ধ অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তীর সংস্পর্শে এসে বিশেষ উপকৃত হন। বাংলা সাহিত্য—বিশেষতঃ রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রবলতর হয়। আই. এ. পরীক্ষাতে প্রত্যেক বিষয়ে পঁচাত্তরের উপরে নম্বর পেয়ে তিনি প্রথম হলেন।

১৯৪৪-এ কলকাতা গিয়ে বাংলাতে অনার্স নিয়ে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হ'তে যান। কিন্তু প্রেসিডেন্সিতে তখন বাংলায় অনার্স পড়াবার বন্দোবস্ত ছিলনা। তাঁকে ভর্তি হ'তে হল স্কটিশ চার্চ কলেজে। সেখানে আর এক সমস্যা—ছাত্রাবাসে স্থানাভাব। তখন বাধ্য হয়ে তাঁকে ফিরে প্রেসিডেন্সি কলেজে এসে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে পড়া শুরু করতে হল। ক্ষুণ্ন মনে বাংলা পড়বার ইচ্ছা বিসর্জন দিয়ে তিনি কলেজ জীবন আরম্ভ করলেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে কলেজের অধ্যক্ষ অপূর্বকুমার চন্দের সঙ্গে আলাপ হ'লে অধ্যক্ষ ছাত্রের বাসনার কথা জানতে পেরে তাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করলেন। অধ্যক্ষের কনিষ্ঠ

১ ছবি আর গান, রঙীন আখর পৃঃ ৩৬

ভ্রাতা শ্রী অনিলকুমার চন্দ তখন শান্তিনিকেতনের শিক্ষাভবন অর্থাৎ কলেজ বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করছেন। অপূর্ব চন্দ তাঁর ভ্রাতার কাছে শান্তিনিকেতনে মোফাজ্জলকে বাংলা অনার্স পড়বার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাভবন তখন প্রাইভেট কলেজ। সেখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুযায়ী বাংলা অনার্স পড়তে থাকলেন মোফাজ্জল হায়দার।

শান্তিনিকেতন থেকেই তাঁর জীবনের সুপ্রভাতের সূচনা। এখানকার উন্মুক্ত পরিবেশ—শিক্ষক-ছাত্রের সহজ আত্মীয়তা—সহজ নিয়মে অথচ ছন্দে বাঁধা জীবনে বিদ্যাসাধন এবং সুপ্রচুর আনন্দের অনুষঙ্গী আয়োজন তাঁর স্পর্শকাতর জ্ঞানকুতূহলী চিত্তকে গভীরভাবে স্পর্শ করল। এ স্পর্শ সোনার কাঠির ছোঁয়া। শান্তিনিকেতনের গভীর তাৎপর্য যাঁরা জানেন—তাঁরা বুঝবেন এর প্রভাব কি আশ্চর্য গোপনে মনের উপরে কাজ ক'রে যায়। বিশেষতঃ সেই মনে—যে মন বলাকা হ'তে জানে। বলাকা হওয়া কেবল আকাশ বিহার নয়, বরঞ্চ জীবনের সকল ক্ষেত্রে নব অনুসন্ধিৎসা নিয়ে সঞ্চরণ। একই সঙ্গে কর্মযোগ এবং আনন্দযোগের অভ্যাস ছিল সেই সময়কার শান্তিনিকেতনের শিক্ষায়। বস্তুতঃ, সে-শিক্ষা বোধ করি নির্ভর করত ব্যক্তিমানসের গ্রহণ ক্ষমতার উপরে। আজকার দিনে অন্ততঃ এমনই মনে হয়। কেবল ক্লাসের পাঠ নয়—সর্বভাবে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া এবং এর যিনি কর্ণধার —তাঁর বক্তব্যের মর্মে প্রবেশ করাতেই শান্তিনিকেতনের শিক্ষার সর্বাত্মক সার্থকতা। এই শিক্ষা দেখতে পাই মোফাজ্জল হায়দারের পরবর্তী জীবনাচরণে। বাস্তব চেতনা আর সমাজ সচেতনতার পাশাপাশি সৌন্দর্যের বোধ।

তাই মনে হয়, শিক্ষাজীবনের এই শেষ পর্বে ভাগ্যদেবীর বর পেয়েছিলেন তিনি—যে-বর তাঁকে স্মরণীয় করেছে—ঘটনাচক্রে সে-বরের দারুণ পরিহাসে আজ তিনি অকালে লোকান্তরিত।

শান্তিনিকেতনের জীবনে জ্ঞানক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পেয়েছেন তিনি তৎকালীন রবীন্দ্রনাথ পদের অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের। এর ছন্দের পাঠ মোফাজ্জলকে প্রচুর আনন্দ দিয়ে ছন্দের মূল সংগতিটি তাঁর চিত্তে মুদ্রিত করে দিয়েছে। জ্ঞানতপস্বী প্রবোধচন্দ্রকে সাধারণ ছাত্রেরা সমীহ ক'রে এড়িয়ে চলত। কিন্তু মোফাজ্জল তাঁর পরিজনহীন প্রবাসে এই পরিবারের স্নেহনির্ঝরের সন্ধান পেয়ে স্নিগ্ধ হয়েছিলেন। অধ্যাপকের পুত্রপ্রতিম হয়ে উঠেছিলেন তিনি তাঁর নির্ভীক যুক্তিবাদের দরুণ। জ্ঞানের তৃষ্ণা নিয়ে কাছে গিয়েছিলেন বলেই জ্ঞানীর অন্তরের আশীর্বাদ তাঁর শিরে বর্ষিত হয়েছিল। তাই ছাত্র যখন নন-কলেজিয়েট পরীক্ষার্থী হয়েও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৬ সালের বি. এ.

অনার্স পরীক্ষায় বাংলাতে রেকর্ড নম্বর পেয়ে প্রথম সারিতে প্রথম হ'লেন---তখন অধ্যাপকের স্নেহাশীর্বাদ বিগলিত হ'ল নতুন নামকরণে---শান্তিনিকেতনের মুখ উজ্জ্বল হ'ল যাকে দিয়ে সে হ'ল 'মুখোজ্জ্বল হায়দার'।

কলকাতার আনন্দবাজার, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান, অমৃতবাজার, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, দেশ---যাবতীয় পত্র-পত্রিকা মুখর হয়ে উঠল এই বাঙালী মুসলমানের প্রশংসায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এর আগে বাংলা অনার্স পরীক্ষায় এত বড় আসন পায়নি আর কোন মুসলিম ছাত্র। মুসলমান ব'লে এই বিশেষ উল্লেখে লজ্জা করিনা। এ ঐতিহাসিক বাস্তবতা পিছিয়ে-থাকা মুসলমান যে এগিয়ে এসে সত্যিকারের বাঙালী হিসেবে বাংলার চর্চাতেও শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারে, একাধিক পরীক্ষায় বিপুল মূল্য দিয়ে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছি আমরা। যাই হোক মুসলমান ছাত্রের সাহায্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি ভঙ্গ হ'ল যেমন, তেমনি রবীন্দ্র নাথের শান্তিনিকেতনেরও মুখোজ্জ্বল হল---সেই আমাদের বড় পাওয়া, মহৎ গৌরব।

শান্তিনিকেতনে ইনি কেবল বাংলার ছাত্র ছিলেন না। অনার্স বিষয়ের সঙ্গে তিনি পড়েছেন দর্শন এবং ইংরেজি সাহিত্য। ইংরেজির অধ্যাপক সুনীল চন্দ্র কর তাঁকে বলতেন---তোমার ইংরেজিতে অনার্স পড়া উচিত ছিল; দর্শনের অধ্যাপক বিনয় গোপাল রায় বলতেন---তোমার উচিত ছিল দর্শনে অনার্স পড়া। এমন কি অধ্যক্ষ অনিলচন্দ পর্যন্ত বলতেন---মোফাজ্জলের উচিত অর্থ অর্থনীতিতে অনার্স নেওয়া। অর্থাৎ কেবল বাংলা সাহিত্যের চর্চাতেই যে তাঁর আগ্রহ সীমাবদ্ধ ছিল, এমন নয়, জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্র সম্পর্কেও তার জিজ্ঞাসা নিয়তজাগ্রত ছিল। ছাত্রজীবনের অধ্যয়নবহির্ভূত আনন্দ আয়োজনেও তিনি ছিলেন অগ্রণী। শিক্ষাভবনের সংস্কৃতি চর্চা সমিতি 'সাহিত্যিকা'র সাধারণ সম্পাদক এবং কলেজ ছাত্র সংসদের সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে তিনি কাজ করেছেন। অর্থাৎ মোফাজ্জল গ্রন্থকীট ভালো ছাত্রমাত্র নন---সংস্কৃতি সাধনা ও ছাত্র সমাজের অন্যান্য কার্য-কলাপের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষতঃ জড়িত ছিলেন। শান্তিনিকেতনের যে কোন প্রবীণ অধ্যাপক আজও মোফাজ্জলের বহুমুখী তৃষ্ণা ও মধুর ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ ক'রে অশ্রুসজল হয়ে ওঠেন। আশ্রমের তদানীন্তন গ্রন্থাগারিক---রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ইংরেজির অধ্যাপক 'তিনসঙ্গী', অনুবাদক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, সরোজিনী নাইডু---কে না এই শান্তস্বভাব ধীমান যুবককে স্নেহের চক্ষে দেখেছেন। 'পুনশ্চ' নিবাসী মোফাজ্জলের শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় গ্রহণ কালে ইন্দিরা দেবী তাঁর খাতায় লিখে দিয়েছিলেন---

'পুনশ্চে' পুনশ্চ এসো
ঢাকায় থেকোনা ঢাকা '

এত সত্ত্বেও নিজের দেশে জীবনপাত করাই মোফাজ্জল শ্রেয় জ্ঞান করেছিলেন।

মোফাজ্জলের অনার্স পরীক্ষার ফল শুনে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি চামড়ায় বাঁধাই করা গীতাঞ্জলি উপহার দিয়ে তাঁকে বলেছিলেন—বাবা বেঁচে থাকলে তিনিই সবচাইতে খুশী হতেন। এই স্বল্পমূল্যের অমূল্য উপহার ভিন্ন অন্যান্য স্বর্ণ পদকের সঙ্গে বিখ্যাত 'সুরেন্দ্র-নলিনী স্বর্ণপদক'ও তিনি লাভ করেন। ১৯৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সে-যাবৎ গৃহীত সমস্ত বাংলা অনার্স পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বরের অধিকারী হিসেবে মোফাজ্জল হাঁয়দার চৌধুরী উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে 'স্যার আশুতোষ স্বর্ণ পদকে' ভূষিত হন। সেই অনুষ্ঠানে উপাচার্যের বক্তৃতাতে তাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছিল।

১৯৪৬ সালে মোফাজ্জল সাহেব, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হলেন। তখন কলকাতায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক অসুবিধাও কিছু দেখা দিয়েছে তাঁর। বিশ্বভারতীর শিক্ষকগণ তাঁদের প্রিয় ছাত্রকে শান্তিনিকেতনে গিয়ে নিরাপদে নিরিবিলি লেখাপড়া করবার জন্য আহ্বান জানাতে লাগলেন। মোফাজ্জল সাহেব শেষ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের স্কলারশিপ নিয়ে সেখানে গিয়ে এম. এ. পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা করতে লাগলেন।

১৯৪৮ সালে বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা সংসদের অন্ত্য পরীক্ষা দিয়ে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে সাহিত্যতীর্থ উপাধি পান। এই পরীক্ষাকে সেই সময় এম. এ. পরীক্ষার সমমানের বলে মনে করা হ'ত। বয়স্ক ব্যক্তি বা গৃহিণীদের নিজ চেষ্টায় অধ্যয়ন করে উপাধি অর্জন করবার সুযোগ দেবার জন্যেই রবীন্দ্রনাথ এই লোকশিক্ষা সংসদের পরীক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন। এই পরীক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত ছিল না। ফলে একভাবে এম. এ. পাশ করা হলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে পাকাপোক্ত এম. এ. ডিগ্রী নেবার জন্য সেই সময় স্নেহময় অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁকে বারবার অনুরোধ করেন। কিন্তু মোফাজ্জল সাহেব অনুমোদিত ডিগ্রীর জন্য চেষ্টা না ক'রে বিশ্বভারতীর গবেষণাবৃত্তি নিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে গবেষণার কাজ শুরু করলেন। উপদেষ্টা-তত্ত্বাবধায়ক হলেন অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন।

১৯৫০ সাল নাগাদ ভারতে যাতায়াতের ব্যাপারে ক্রমশঃ কড়াকড়ি দেখা

দিতে লাগল। তাই মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী আপন দেশ পূর্ব বাংলায় এসে বসবাস করাই স্থির করলেন। পিতার বীমা বাবদে প্রাপ্ত অর্থ এই সুদীর্ঘ সময়ে নিঃশেষ হবারই কথা। এই সময় থেকে সাংসারিক দায়দায়িত্বের দিকেও স্বভাবতঃই বেশী করে মন দিতে হ'ল তাঁকে। ছোট ভাই কাঞ্চন ও নিনু আর এক বোন রাজু। ভাই দুটি অবশ্য ততদিনে মোটামুটি আত্মনির্ভরশীল। কাঞ্চন ওরফে এহ্‌তেশাম হায়দার চৌধুরী তখন কাজ করেন 'ইনসাফ' কাগজে—লেখাপড়ায় গ্রাজুয়েট। নিনু---লুতফুল হায়দার চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পড়তেই কাজ করছেন 'সংবাদে'। তখনকার দিনে সাংবাদিকতায় তেমন বিত্ত না থাকলেও ভাইরা সাধ্যমত নিজেদের ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছেন। অসহায় কেবল বোনটি। নোয়াখালীর গোঁড়া মধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যা হ'লেও ভগ্নী রওশন আখতার রাজিয়াকে মোফাজ্জল হায়দার আধুনিক শিক্ষা দিতে একান্ত আগ্রহী ছিলেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে বই খাতা, রবার, পেন্সিল যাবতীয় উপকরণ নিয়ে বাড়ী গিয়ে এক বছর বয়সে-পিতৃহারা এই মেয়েটিকে পরম যত্নে কাছে টেনে নিয়ে, ভাইজান তার মনোমত বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে পাঠ্য বিষয় নির্বাচনে ঝোঁক ছিল তাঁর। সম্বৎসরে গ্রীষ্মের ছুটির এই দুটি মাসই শুধু বোনটির লেখাপড়া ; ছুটির মাসের চর্চাটুকু সম্বল করে বিদ্যালয়ে যাওয়া হ'ত কেবল পরীক্ষা দেবার সময়।

ঢাকা এসে এই বোনটিকে কাছে নিয়ে এলেন তিনি। তাঁর স্নেহচ্ছায়াতে থেকেই শেষ পর্যন্ত রাজু বাংলায় এম. এ. পাশ করে।

ঢাকায় মোফাজ্জলের প্রথম চাকরী রেডিওতে। শান্তিনিকেতনের পরিচিত শামসুল হুদা চৌধুরীর কৃপায়। তাও সামান্য স্ক্রিপ্ট রাইটারের কাজ। কিন্তু এ চাকরী বছর খানেকের বেশী করা হ'লনা। পাঞ্জাবী পায়জামা প'রে আপিস করা নিয়ে আপত্তি উঠল। সরকারী পোশাক পরবার জন্য উচ্চমহলের নির্দেশ জানানো হল তাঁকে। সঙ্গে সঙ্গে চাকুরীতে ইস্তাফা দিয়ে চলে এলেন মোফাজ্জল হায়দার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'সাহিত্য ভারতী' উপাধিতে এম. এ. ডিগ্রীর মান দিতে অসম্মত। সেখানে চাকুরী হওয়া দায়। মোফাজ্জল হায়দারেরও জেদ কম নয়---ছোট দুই ভাইয়ের পৌনঃপুনিক অনুরোধ সত্ত্বেও কিছুতেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পরীক্ষা দিতে রাজী হলেন না।

আবদুর রহমান খা সাহেব তখন ঢাকার জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি মোফাজ্জলের বি. এ. অনার্সের ফল শুনে বললেন এত বড় কাণ্ড যে করতে পারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে---তার এম. এ. ডিগ্রী থাক না থাক---তাকে কলেজে

পড়াতে দিতেই হবে। অধ্যাপক অজিত গুহ এ-ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে ভালো যোগাযোগ থাকাতে তিনি মোফাজ্জল হায়দারের যোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। পরবর্তীকালে এদেশের সাংস্কৃতিক সঙ্কটের আলোচনায় তারা পরস্পর কাছাকাছি হয়েছিলেন। জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপনা করবার সময় অজিত কুমার গুহের সঙ্গে মোফাজ্জল হায়দারও লোকশিক্ষা সংসদের ঢাকা কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক হন। এঁদের পরিচালনায় পরীক্ষা হবার পর, মূল্যায়নের জন্য খাতা চ'লে যেত শান্তিনিকেতনে। পরীক্ষার্থী সংগ্রহ, তাদের পাঠে সহায়তা দান এবং পরীক্ষা গ্রহণ ছিল ব্যবস্থাপকদের দায়িত্ব। এই পরীক্ষা সূত্রে অধ্যয়নব্যাপদেশেই বর্তমান প্রবন্ধলেখক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম এবং অন্যান্যদের সঙ্গে মোফাজ্জল হায়দারের সংস্পর্শে আসেন।

জগন্নাথ কলেজের সঙ্গে সঙ্গে তখনকার সেন্ট গ্রেগরীজ কলেজ---বর্তমানের নটারডাম কলেজে তিনি খণ্ডকালীন অধ্যাপনায় নিরত ছিলেন।

১৯৫৩ সাল নাগাদ মোফাজ্জল হায়দার উপলব্ধি করলেন 'যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন তাঁর যোগ্যতাকে কিছুতেই মেনে নেবেনা--তখন যেমন-তেমন একটা পরীক্ষা দিয়ে দেওয়াই ভালো। ততদিনে সাহিত্য আলোচনার আসরাদিতে বক্তৃতা দান এবং পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ সূত্রে এদেশে তিনি সুপরিচিত হয়ে উঠেন। অনিয়মিত এবং শিক্ষক পরীক্ষার্থী হিসেবে একই সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষা দেন তিনি। এম. এ. শেষ পর্বের পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান পান।

বহুদিন অধ্যাপনা করবার এবং দেশের সংস্কৃতিবান মানুষের কাছে স্বীকৃতি পাবার পরেও এইভাবে যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে মোফাজ্জলকে অন্তরে প্রভূত পীড়া ভোগ করতে হয়েছে। আমি জানি না, এর আগে, আর কখনও তিনি মনের এত বিরুদ্ধে গিয়ে প্রতিকূল পৃথিবীর দাবীকে এমন ক'রে মেনে নিয়েছিলেন কিনা। পৃথিবীতে বিচারের বিশেষ মানদণ্ড রাখতে হয়, সে কথা মানলেও, এই ক্ষেত্রে মোফাজ্জল সাহেবের এই পরাজয়কে নিতান্ত সহজে মেনে নিতে পারা যায় না। তাঁর যোগ্যতার এই পরীক্ষা নিতান্তই আনুষ্ঠানিক ব্যাপার---একথা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ ভালো করেই জানতেন।

১৯৫৫তে মোফাজ্জল হায়দার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন। লোক শিক্ষা সংসদের অন্ত্য পরীক্ষাকে একভাবে শান্তিনিকেতনের এম. এ. বলা হ'ত বলে অনেকের ধারণা হ'ল। শান্তিনিকেতনের উপাধি নেহায়েৎ তুচ্ছ। মোফাজ্জল হায়দারের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেওয়া যেন শান্তিনিকেতনের উপাধিকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করা। অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদস্থ শিক্ষকদের মনে

এ ধারণা বলবৎ দেখেছি। তাই মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সুযোগ লাভকে আমি তেমন সম্মানের মনে করতে পারিনি কখনও। মোফাজ্জল হায়দারের মনে এ দুঃখ কম বাজেনি। আমি বলব, বড় ক্ষুণ্ন মনে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মে প্রবেশ করেছিলেন।

এই জাতীয় মর্মপীড়া তিনি জীবনে অনেক ভোগ করেছেন। যে-আদর্শ মনে রেখে চলতে চেয়েছেন, দেখেছেন পৃথিবীর পথ তার অনুকূল নয়। জীবনের চতুর্দিকের মানুষের কাছ থেকে সেই পরিশীলিত রুচি তিনি আশা করতেন। বেখাপ্পা বিদেশী সাজসজ্জার সঙ্গে সচিত্র সিনেমা পত্রিকার পাতা ওলটানো, ক্রিকেট উন্মত্ততা, রেডিও সিলোন আর মুহম্মদ রফি চারিপাশে এই চর্চা দেখতে দেখতে তিনি ব্যাকুল প্রশ্ন করেছেন। আমরা কোথায় চলেছি। কিংবা আমারই ভুল? [১] তাঁর স্বভাবের মৃদুতা, রুচির স্নিগ্ধতা বারবার আঘাত পেয়েছে প্রতিকূল পরিবেশের কাছে।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী একজন মহামানব ছিলেন এমন কথা আমি বলতে চাইনা। একজন মানুষের পক্ষে খাঁটি মানুষ হওয়াই যথেষ্ট। বস্তুতঃ মানুষের যা হওয়া উচিত তা হয়না বলেই খাঁটি মানুষ দেখলে আমরা তাকে মহামানব আখ্যা দিতে উদ্যত হই। মোফাজ্জল হায়দার কেবল আকাশের দিকে চোখ তুলে পথ হেঁটেছেন আর মুখে আক্সার আদর্শের বুলি আউড়েছেন— ব্যাপারটা ঠিক এমন নয়।

পৃথিবীর মাটির সঙ্গে আবাল্য পরিচিত তিনি। শৈশবে পিতৃহারা হবার ফলে জীবনের কঠিন সত্য তাঁর সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। ভাই-বোনদের জন্য অসীম করুণা বোধ ক'রে তাদেরকে ধ'রে রাখতে চাইতেন একান্ত কাছে। নিজের অন্তর দিয়ে তাদের অসহায়তা অনুভব করতেন। ফলে ব্যক্তিজীবনের আরম্ভেই কিছু নিষ্ঠুর সত্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। মা এবং মামা আর্থিক ব্যাপার বা সম্পত্তির মামলা থেকে তাঁকে দূরে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন বটে, কিন্তু প্রখর অনুভূতির দরুণ তিনি বাস্তবের রূঢ়তার রূপ বেশ স্পষ্টই দেখেছেন। সম্ভবতঃ একারণেই তিনি মনের দিক থেকে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। একা একা পিতার কবরে গিয়ে তাঁর একান্ত অনুভূতিগুলো তিনি লিপিবদ্ধ করতেন। বিদ্যাশিক্ষার জন্য অধিকাংশ সময় বাড়ীর বাইরে থেকেছেন। মাতার স্নেহাশীষে একাকিত্বের বেদনাজনক অনুভূতির নিরসন ঘটনাবার সুযোগ মেলেনি। এমনি ক'রে শেষে, নিরাশায় প্রকৃতির সাহচর্যে শান্তির অণ্বেষণ করেছেন, আনন্দ প্রার্থনা করেছেন। প্রাঙ্গণের কামিনী গাছের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দ্বিপ্রাহরিক অবকাশে

---

১ রুচি, রঙীন আখর পৃঃ ৩১

মেঘের সঞ্চরণ লক্ষ্য করে নানা কল্পনায় বিভোর হয়ে একটু ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। বাস্তবকে জেনে—তার দুঃখে নিজেকে নিঃশেষ না ক'রে আত্মস্থ হয়ে পরিবেশ থেকেই সান্ত্বনা খুঁজে নিয়ে তিনি বেঁচেছেন। তাঁর লেখাতেও একথা পাই।

'জীবনে অনেক দুঃখে দুঃখী আমি। পিতৃহারা ছেলে, দুঃখ কষ্ট অনাদরে মানুষ হয়েছি। কিন্তু অন্তরে বিধাতা আমার কোনো দৈন্য রাখেননি। বাইরের দুঃখ সেইখানে পুষিয়ে নিয়েছিলেন।[১]

নোয়াখালীর ছেলে—যাবতীয় মসলা-মাসায়েল সমেত ধর্মীয় শিক্ষা পেয়েছিলেন যথারীতি। আরবী পাঠে এমন উৎসাহ ছিল যে, মোটামুটি অনুবাদের ক্ষমতাও অর্জন করেছিলেন। পাশাপাশি রবীন্দ্রসাহিত্য পড়তে গিয়ে প্রবল এক প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন একদিন। এমন মানবতার বাণী যাঁর রচনায়, তিনি যে হিন্দু। হিন্দু তো কখনও বেহেশ্তের অধিকারী হতে পারেনা। রবীন্দ্রনাথের ছবি এঁকেছেন নিজে--সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন বয়সের বিচিত্র পট। সে-চেহারা দেখে বিশ্বাস হয় না---নরকই এঁর গতি। মায়ের কাছে একদিন তর্ক তুললেন এই নিয়ে। দিনে দিনে মানবচেতনা যত গভীর হ'ল—ততই সঙ্কীর্ণ ধর্মশিক্ষা বিধানের ত্রুটি ধরতে পারলেন। সাম্প্রদায়িক গণ্ডী উত্তরণের এই হ'ল মানবিক ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তর ধর্ম তাঁকে উদার জগতে টেনে নিয়েছিল।

জীবন সম্পর্কে তিনি বড় আশাবাদী ছিলেন না। তাঁর ধারণা ছিল দুঃখ দৈন্যই আমাদের পৃথিবীতে প্রধান। কিন্তু নিরন্তর দুঃখ দৈন্যের বোধ জীবনী-শক্তিকে ম্রিয়মাণ করে বলে তার থেকে মুক্তি খুঁজে উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে হৃদয়কে বিস্ফারিত করি আমরা, মনকে সঞ্জীবিত করি। এ দরিদ্র দেশে উৎসবের দিনে সাধ্যের অতিরিক্ত আয়োজন ক'রে দীনতাকে সবলে অস্বীকার ক'রে আমরা মনটাকে একটু হালকা করতে চাই। বড় নির্মম এই উপলব্ধি। বুঝি এই জন্যেই মোফাজ্জল হায়দার বলেছেন—গোধূলি আর সন্ধ্যার ম্লানিমার চাইতে প্রভাত এবং দ্বিপ্রহরের আকর্ষণ তাঁর কাছে অনেক বেশী ছিল। স্বচ্ছ সরোবরের নিস্তরঙ্গ জলে শাপলা ফুলের ঋজু প্রভাত অভিবন্দন—শরতের স্বচ্ছ নীল আকাশ আর শুভ্র মেঘ তাঁর প্রাণে উজ্জ্বল আনন্দের বাণী বয়ে এনেছে। কৈশোরে লিখিত একটি অপটু কবিতায় প্রভাতের বিমল আনন্দে তাঁর হৃদয় কেমন ক'রে পূর্ণ হয়ে উঠত তার বর্ণনা রয়েছে---

উষার মোহিনী সুরে
ঐ শোনা যায় দূরে

---

১ লেখার উৎস : রঙীন আখর পৃঃ ৪২

বাজিছে প্রেমের বাঁশী
ধরাতল হল খুশী
গান উঠে পুরে পুরে,
হৃদি মোর ভরে সুরে।।[১]

মনের ঐশ্বর্য দিয়ে বাস্তবের কঠোরতার মধ্যে পথ করে নিয়েছেন তিনি। বিশেষতঃ প্রথম ভাগে তাঁর মধ্যে এই দুঃখজয়ী সজীবতা আমরা লক্ষ্য করেছি।

এই সজীবতার দরুন তাঁর বিশ্বাস ছিল, যে-কোন বিষয় যুক্তি সম্মতভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপন করলে বিষয় গুণে তা সকলের গ্রাহ্য হ'তে পারে। এ হ'ল মানুষের প্রতি বিশ্বাস—সবমানুষের ভিতর মৌলিক মানবতা গুণে বিশ্বাস। এইজন্য কোন বিষয়ে মনে আন্দোলন উপস্থিত হ'লে তিনি প্রবন্ধ তো লিখতেনই, অনেক সময় দৈনিক পত্রিকায় চিঠি পাঠাতেন। ঢাকা শহরে ফুলের দৈন্য সুস্পষ্ট ছিল। মোফাজ্জল হায়দার তা নিয়ে আক্ষেপ করেছেন—শহর-বাসীর বোধোদয়ের চেষ্টা করেছেন নিবন্ধ রচনা করে। ফুলের অভাব একটি বড় শহরের মস্তবড় অঙ্গহীনতার পরিচয়। শহর পরিকল্পনায় শৃঙ্খলার সথে সুষমার সমাবেশ আকাঙক্ষা করেছেন তিনি।

কোমল—মৃদু স্বভাবের নিতান্ত নিরীহ সাহিত্যের অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার শহর পরিকল্পনা নিয়েও প্রচুর মাথা ঘামিয়েছেন। শহরের মাঝখানে ষ্টেডিয়াম নির্মাণের ব্যাপারে তিনি আপত্তি জানিয়েছিলেন। বিদেশে ষ্টেডিয়াম তৈরী হয় ধূলোবালির এলাকা ছাড়িয়ে শহরের একান্তে। ঢাকার ষ্টেডিয়াম তৈরী হল ঠিক শহরের মাঝখানে। শিশুদের জন্য পার্কের অভাব শহরবাসীর স্বাস্থ্যের পরিপন্থী—এ নিয়ে চিঠিপত্রের কলামে আলোচনা তুলেছেন তিনি, বায়তুল মোকাররমের অবস্থান নিয়েও আপত্তি ঘোষণা করেছেন। বিশেষ প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন মোহাজেরদের জন্য ভিন্ন উপশহর নির্মাণে। তাঁর যুক্তি ছিল, এতে তারা স্বতন্ত্র হয়ে থাকবে—কোনদিন মিলতে পারবেনা এদেশীদের সঙ্গে। স্বাধীনতা সংগ্রামকালে এ-সত্য নিষ্ঠুরভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। 'One who knows' স্বাক্ষরে তদানীন্তন Pakistan Observer এ এই চিঠি ছাপা হবার পর Morning News এ সংবাদ বেরুল—Pakistan Observer slanders Mohajirs পশ্চিম পাকিস্তানের Dawn ইত্যাদি কাগজে ও এই খবর ফলাও করে ছাপা হল। কুখ্যাত দেওয়ান ওয়ারাসত আলীর নেতৃত্বে আন্দোলন হয়েছিল এই বিষয়ে।

এই জাতীয় নানা কারণে—বিশেষতঃ মোফাজ্জলের বলিষ্ঠ সত্য ভাষণের

১ লেখার উৎস, রঙীন আখর পৃঃ ৪৪

জন্য আজাদ, Morning News, পয়গাম, সংগ্রাম প্রভৃতি পত্রিকা সমালোচনায় মুখর হয়েছে অনেকবার। ব্যক্তিগত কুৎসিত আক্রমণের রেওয়াজ তারা যথাযথ রক্ষা করেছে।

মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনসেন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের ছাত্রদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নয় ব'লে বাংলা বিভাগীয় প্রধান ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে আক্রমণ ক'রে আজাদ পত্রিকা এক অভিযান চালিয়েছিল। মোফাজ্জল হায়দার এর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন অকাট্য যুক্তি বিন্যাস করে। 'আজাদে'র রবীন্দ্র-বিরোধী প্রচারের প্রতিবাদ রচনায় 'ইত্তেফাকে'র আহ্‌মেদুর রহমানকে মোফাজ্জল প্রভূত সাহায্য করেছিলেন।

বৈঠকখানায় ব'সে আমরা দেশের সকল প্রকার অব্যবস্থার মুণ্ডপাত ক'রে যে বিমল আনন্দ উপভোগ ক'রে থাকি, মোফাজ্জল হায়দার তার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন বক্তব্যগুলিকে সুষ্ঠুভাবে সাধারণের সামনে উপস্থাপন ক'রে জনমত গঠন করা আবশ্যক। এই মতের ভিতর মনুষ্যত্বের উপর বিশ্বাস ছাড়া আর একটি জিনিসও লক্ষ্য করা যায়। প্রয়োজন সাধনের প্রতি, কাজের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা। কাজের ঝোঁক তাঁর বরাবরের। ছাত্র জীবনের সাধনা, সেই জীবনের কর্মও তার সাক্ষ্য দেয়।

কর্মের সাধনায় প্রথম প্রয়োজন শৃঙ্খলার। শিল্পীমনের সঙ্গে শৃঙ্খলার শত্রু-সম্পর্ক কল্পনা করবার একটি প্রচলন আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা হ'তেই পারে। কিন্তু মোফাজ্জল হায়দারের সৌন্দর্যপ্রিয় এবং স্পর্শকাতর স্বভাবের সঙ্গে পারিপাট্যের সুষম সমাবেশ দেখেছি। 'আমাদের নববর্ষ উৎসব', আলোচনাতে তিনি বলেছেন---

> আমাদের জীবন কতো মালিন্য, তুচ্ছতায় ভরে উঠেছে। আজ তাকে সযত্নে মুছে ফেলে তার উপর একটুখানি সুষমার রেখা ফুটিয়ে তুলতে হবে। আজ প্রকৃতির সুরে সুরে মিলিয়ে আমাদের নবীন হতে হবে। হিসাবের খাতাটি নতুন করে খুলতে হবে, কাজের আসনটি নতুন করে পাততে হবে।[১]

পয়লা বৈশাখের হালখাতার কথায় কর্মে নবপ্রবর্তনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

পিতার কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন সুশৃঙ্খলভাবে গুছিয়ে কাজ করবার স্বভাব। তাঁর নথীপত্র সংরক্ষণের নৈপুণ্য দেখে আমরা চমৎকৃত হই। বিভিন্ন সময়ে কাগজে প্রকাশিত প্রয়োজনীয় সংবাদ বা রচনা কি পত্র, বিষয়সম্পত্তি

---

১ রঙীন আখর পৃ ১৩

সংক্রান্ত কাগজপত্র সব কিছু এমন সুবিন্যস্ত আছে যে দরকারের সময় হাতড়ে বেড়াতে হয় না।

ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটিও তেমনি সুসংরক্ষিত। প্রতিটি বই নিজের হাতে ঝেড়ে মুছে পরম যত্নে গুছিয়ে রাখতেন তিনি। ছাত্র জীবনে ছুটিতে গ্রামে গেলে বইয়ের আলমারীর পরিচর্যা হত। নিমপাতা শুকিয়ে পাতার ফাঁকে ফাঁকে রাখতেন পোকার উপদ্রব নিরোধ করবার জন্য।

১৯৫৬তে মোফাজ্জল হায়দার বিয়ে করেন। স্বল্পবিত্ত ঘরের ছিমছাম রুচির একটি শিক্ষিতা মোটামুটি লাবণ্যময়ী মেয়ে তাঁর ঘরে আসবে, এই ছিল তাঁর কল্পনা। ফুটফুটে সুন্দরী ধনীর মেয়ে সংসারে কতটুকু লক্ষ্মীশ্রী আনতে পারে, এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল। সৈয়দা তাহ্‌মিনা মনোয়ারা নূরুন্নাহারকে মা ও ভাইয়েরা পছন্দ ক'রে ঘরে এনেছিলেন। দুইপুত্র সুমন আর শোভনের মাতা ও পিতারূপে ঘরে বাইরে দায়িত্ব পালন করবার জন্য এঁকে তিনি আজ রেখে গেছেন।

১৯৫৮তে মোফাজ্জল হায়দার ব্রিটিশ কাউন্সিলের বৃত্তি নিয়ে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েণ্টাল স্কুলে ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য সস্ত্রীক বিদেশে যাত্রা করেন। সেখানে দুই বৎসর গবেষণা করবার পর অধ্যাপকের সঙ্গে মতানৈক্যের দরুণ উক্ত কাজ স্থগিত রেখে তিনি দেশের পথে রওনা হন। এই ঘটনা এদেশে তাঁর সম্মানকে ক্ষুণ্ণ করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা কেউ কেউ এই ব্যাপারে তাঁকে অতি ভাবপ্রবণ ব'লে অভিহিত করেছেন। বিলেতে অধ্যয়নকালে ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। এই গবেষণার ফলে রচিত তাঁর একটি গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। ধ্বনিতত্ত্ব চর্চা করতে গিয়ে অবাঙালীদের বাংলাভাষা শিক্ষা দেবার সুশৃঙ্খল উপায় নিয়ে তিনি চিন্তা করেন। পরে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে অবাঙালীদের জন্য বাংলাভাষা শিক্ষার একটি কোর্স খোলা হ'লে তিনি সেখানে শিক্ষকতা করতে করতে এ বিষয়ে 'Colloquial Bengali' নামে একটি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। এই গ্রন্থটি প্যারিস এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়েও পাঠ্য পুস্তকরূপে গৃহীত হয়।

পূর্বে বলেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পরীক্ষা দিতে গিয়ে তিনি পরাজয়ের গ্লানি ভোগ করেছিলেন। তারপর থেকেই, পত্র পত্রিকার প্রবল বিরুদ্ধে সমালোচনা এবং পরিশেষে লণ্ডন থেকে উপাধি না নিয়ে ফিরে আসা ইত্যাদি কারণে মোফাজ্জল হায়দার ম্রিয়মান হয়ে পড়লেন। যে-উৎসুক, সৌন্দর্য পিয়াসী, কল্পনাপ্রিয় অথচ কর্মঠ সজীব মন তাঁর ছিল, তা যেন নানা অবমাননা অবহেলায়

ম্লান হয়ে গেল। কি-রকম একটা আত্মবিস্মৃতি তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল কিছুদিন। 'লেখার উৎস' নামে একটি নিবন্ধে তিনি বলেছেন---

> অনেক কথা, অনেক ভাব আমার মনের ভেতরেই গুমরে গুমরে মরে গেছে, ভাষা পায়নি, বাইরের জগতে তারা মুক্তি পায়নি।[১]

বলেছেন, 'আত্মপ্রকাশের সুযোগ' তেমন করে তিনি পাননি। মোফাজ্জল হায়-দারের বিলেত যাত্রার বৎসর ১৯৫৮ থেকে আইয়ুব খানের শাসন প্রচলিত হয় দেশে। শুধু মোফাজ্জল হায়দার কেন যে-কোন প্রকাশোণ্মুখ হৃদয় এ-সময়ে যন্ত্রণায় গুমরে মরেছে। কণ্ঠরোধের সরকারী প্রচেষ্টা তখন সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়া করে যাচ্ছে। যে-বাংলা একাডেমী বাহান্নর আন্দোলনের বুকের রক্তে গড়া-তারই একাংশে 'লেখক সঙ্ঘের' আপিস খুলে লেখকদেরকে সরকারীভাবে ঐক্যবদ্ধ করা হচ্ছে। তাঁদেরকে হাতের মুঠোয় রাখবার সর্ব চক্রান্ত চলছে।

এদেশের অধিকাংশ সাহিত্যিকের মত মোফাজ্জল হায়দারও এই সঙ্ঘের সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সদস্যপদভুক্ত ছিলেন তিনি। বাংলা একাডেমী এবং লেখক সঙ্ঘ এই দুই জায়গা থেকেই বুঝে শুনে বাংলা সাহিত্যের কিছু কিছু কাজ করা চলত সেই দিনগুলোতে। সরকার তুষ্ট থাকতেন এদেরকে হাতে রাখা গেছে মনে করে। অনেককে দিয়ে তাঁরা তাঁদের শাসন যন্ত্রের প্রশস্তি গাইয়ে নিতেও পেরেছেন। প্রশস্তি গাওয়ানো যায় এমন লেখকদের সঙ্গে যাঁরা সেখানে সংঘবদ্ধ হয়েছেন—সচেতন মনের লোকেরা তাঁদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন সে-সব দিনে। সর্বব্যাপী জাল ছড়ানো হয়েছিল সরকার থেকে–সূক্ষ্মও বটে সে জাল--বহু রথী মহারথী ধরা দিয়েছেন তাতে।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সেই জালের ভিতর থেকেও স্বাধীন চেতনার কথা ঘোষণা হ'তে লাগল থেকে থেকে—সেই খানেই জয় আমাদের। প্রবল বলে রোধ করা কণ্ঠও মুক্তির জন্য ফুকরে উঠতে জানে, বিস্ময় সেইখানে। তাই দেখি বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের মত কেন্দ্র অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠানও রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চায় উৎকর্ষের জন্য শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে মোফাজ্জল হায়দারকে অভিনন্দিত করেন।

স্বাধীনতার আন্দোলন পুরোদস্তুর শুরু হলে ১৯৭১-এর একুশে ফেব্রুয়ারীতে মোফাজ্জল হায়দার শহীদ মিনারে বুদ্ধিজীবী সমাবেশে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্লাবে অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন ক'রে বক্তৃতা করেন। 'পূর্বদেশ' পত্রিকা থেকে স্বাধীন দেশের নামকরণ সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি

---

১ রঙীন আখর পৃঃ ৪৫

'বাংলাদেশ' নামের প্রতি তাঁর সমর্থন জানিয়েছিলেন। আজ দেশ-কাল সম্প্রদায়ের অতীত কবির গান যখন জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পেয়েছে, তখন সেই আনন্দের সুরে কণ্ঠ মেলাবার জন্য তিনি আমাদের মাঝখানে নেই।

তিনি বলেছিলেন—

> আমাদের আজকের এই বিক্ষুব্ধ ঘোলাটে কাদা-মাটির পানি কোনদিন শান্ত স্থির হয়ে নির্মল অচঞ্চল সরোবরের রূপ ধারণ করবে, তারই প্রতীক্ষায় আছি। বিশ্ব-সাহিত্যের বিচিত্র ঐশ্বর্য আহরণে সমৃদ্ধ, অন্তরের আনন্দরসে উদ্দীপিত সাহিত্যিক তখনই সার্থক সৃষ্টিকার্যে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন। সেদিনই হবে সৃষ্টির যথার্থ অবসর।[১]

সেই অবসরের অনুকূল অবস্থা --সৃষ্টির সুযোগ আজ যখন আসতে যাচ্ছে—এমন সময় তাঁর প্রতীক্ষা কেন অকস্মাৎ শেষ হয়ে গেল।

মোফাজ্জল হায়দারের জাগতিক সাফল্যের অনেক নিদর্শন আমরা উল্লেখ করতে পারি। কিন্তু এ দিয়ে তাঁর অস্তিত্বের পরিমাপ করা যাবে না। কারণ, তাঁর কর্মজীবনের স্বাভাবিক পরিণতি ঘটেনি, তাঁর আত্মপরিচর্যা অসমাপ্ত থেকে গেছে। আমরা জেনেছি, মোফাজ্জল ভ্রাতার বলিষ্ঠ আশ্রয়, ভগিনীর অবলম্বন, মাতার ভক্ত ও কর্তব্যপরায়ণ নির্ভর। সসম্ভ্রম দূরত্ব বজায় রেখে চললেও ভ্রাতৃবধূরা পেয়েছেন ভাইজানের অকুণ্ঠ স্নেহ। স্বামীর সঙ্গে মন কষাকষি হ'লে ভাইজানের গৃহ হ'ত ভ্রাতৃবধূদের গোঁসাঘর। তাই এই পরিবার ছেড়ে আত্মরক্ষার্থে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে চলে যাওয়া সম্ভব হয়নি, তাঁর। এমনিতে পৃথগন্ন হ'লেও আত্মিকভাবে এই পরিবার সম্পূর্ণভাবে তাঁরই মুখাপেক্ষী ছিল।

অথচ এই মোফাজ্জলই ব্যক্তিমানুষ হিসেবে ছিলেন সবার সুদূর। বাল্যের কঠিন অভিজ্ঞতার সত্তদারূপে পাওয়া একাকীত্ব তাঁকে বরাবর একটি দ্বীপের নিঃসঙ্গতায় ঘিরে রেখেছিল। মোফাজ্জলের কতিপয় পরিচিতজনকে তাঁর সম্পর্কে বলতে শুনেছি—কুঁকড়ে থাকা পোশাকী মানুষটাকেই দেখলাম কেবল; ভিতরটা কিছুতেই জানা গেলনা। কে জানে—অন্তরের মানুষটিকে খুঁজেছিলেন কিনা তাঁরা; কিম্বা তাঁর স্বভাবের মৃদুতাকে দুর্বলতা ভেবে তাঁকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন।

অনেকেই মনে করেন চরিত্রের দৃঢ়তা বা বলিষ্ঠতার প্রকাশ রুদ্র আচরণে। প্রবল চীৎকার, ক্রুদ্ধ আস্ফালন, এবং যাবতীয় মনোভাবের সরব ঘোষণাই বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচয়। ভদ্র মার্জিত আচরণ, নম্রতা, স্বাভাবিক বিনয়াদি চারিত্রিক মাধুর্য হাস্যকর মেয়েলীপনা মাত্র। আমাদের সমাজের বিবেচনায় রঘুপতিই নায়কোচিত গুণের অধীশ্বর, গোবিন্দমাণিক্য তুচ্ছ পাঁঠাবলির ইংগিতে কাতর

---

১ সৃষ্টির অবসর, রঙীন আখর পৃঃ ৫

এক দুর্বল চরিত্র অযোগ্য রাজা। রাবণের মত চীৎকার ক'রে আপন ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা না করলে, ক্ষমতাদম্ভে নিয়ন্ত্রিত সমাজে চারিত্রিক সবলতা প্রচার হয়না। মোফাজ্জল হায়দার রাবণিক আস্ফালনে অপারগ ছিলেন।

শেষদিকে ভ্রাতৃবধূদের নিয়ে, তাদের সন্তানদের নিয়ে, সুমন শোভনকে নিয়ে তিনি যেন কিছুটা কাছের মানুষ হয়ে উঠছিলেন ক্রমশঃ। স্নেহে-বাৎসল্যে জমাট নিঃসঙ্গতাবোধ যেন গলতে শুরু করেছিল। তাই শান্তিনিকেতন গড়বার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিলেন। ঢাকার সন্নিহিত পুবাইলের পরিত্যক্ত জমিদার বাড়ীকে কেন্দ্র ক'রে একটি পাঠশালা গড়ে তুলবার সাধ হয়েছিল তাঁর। উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুমনের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী সকল বৃত্তি পরিস্ফুরণের অনুকূল একটি আনন্দ বিদ্যাপীঠ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন মোফাজ্জল।

মোফাজ্জল আশা করছিলেন বাঙালী তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে আর মুক্ত মনের মানুষ হিসেবে বাঙালী সন্তানদের লালন করবার সুযোগ তিনি পাবেন। নতুন উৎসাহ জেগেছিল তাঁর মনে। এজন্যেই মনে হয়, মোফাজ্জলের জাগতিক সাফল্যের তালিকায় তাঁর আত্মার স্বাক্ষর নেই। সৃষ্টির পরিবেশ তিনি পাননি, মানস সন্তান সৃষ্টির অপর পরিকল্পনাও তাঁর অসমাপ্ত রয়ে গেল। মনের মধ্যে এত বড় অভিলাষ নিয়ে, জীবনে যোগ্যভাবে সুন্দর ক'রে বাঁচবার জন্য এই প্রবল আকাঙ্খা সত্বেও অমানুষিক বীভৎসতায় তাঁর জীবন খণ্ডিত হ'ল।

যতখানি পাবার কথা ছিল তার কতখানি থেকে যে আমরা বঞ্চিত হলাম তার পরিমাপ করব কি দিয়ে। জীবনের যে অশেষ ক্ষমতা এবং অন্তহীন অক্ষমতা বিচিত্র চরিত্র মানুষের একক জীবন বিচারে তার কতটুকু কল্পনা ক'রে বোঝা সম্ভব?

পরিশিষ্ট

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর জীবনপঞ্জী

১৯২৭	জন্ম। নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার খালিসপুর গ্রাম।
১৯৪২	প্রবেশিকা পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৯৪৪	ইণ্টারমিডিয়েট আর্টস্ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার: ঢাকা বোর্ড।
১৯৪৬	বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বি. এ. অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সুরেন্দ্র-নলিনী স্বর্ণপদক অর্জন।

১৯৪৮ অন্ত্য পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে 'সাহিত্য ভারতী' উপাধি লাভ। লোকশিক্ষা সংসদ, বিশ্ব ভারতী।

ঢাকা বেতার কেন্দ্রে স্ক্রিপ্টরাইটারের চাকুরী গ্রহণ।

ঢাকার জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপক পদে যোগদান।

ঢাকার সেন্ট গ্রেগরীজ বা নটারডাম কলেজে খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে কর্ম।

১৯৫৩ বাংলায় এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯৫৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে যোগদান।

১৯৫৬ বিবাহ।

১৯৫৮ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এযাবৎকাল অনুষ্ঠিত বাংলা অনার্স পরীক্ষায় অপ্রতিহত রেকর্ড নম্বরের অধিকারী হিসেবে 'স্যার আশুতোষ স্বর্ণপদক' অর্জন।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের বৃত্তিতে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টাল স্কুলে ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণার জন্য বিলাত যাত্রা।

'রবি-পরিক্রমা' গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৬৩ 'রঙীন আখর' গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৬৪ জ্যেষ্ঠপুত্র সুমনের জন্ম।

১৯৬৭ কনিষ্ঠপুত্র শোভনের জন্ম।

১৯৭০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার পদে উন্নতি।

কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনার জন্য বিশেষ অভিনন্দন।

১৯৭১ মহাপ্রয়াণ।

১৯৭২ বাঙলা একাডেমী কর্তৃক এই সালের একুশে ফেব্রুয়ারী গবেষণা পুরস্কার ঘোষণা।

বিশ্বভারতীতে 'মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী গবেষণা বৃত্তি' প্রবর্তনের প্রস্তাব।

সভাপতির ভাষণ

কবীর চৌধুরী

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর জীবনের সব ঘটনা না জানলেও তাঁর স্বভাব, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব আমাদের জানা ছিল। মানুষকে উপলব্ধির জন্য ঘটনার প্রয়োজন তার চরিত্রের অবলোকনে। আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর জীবনের বিচিত্র ঘটনা আমরা জেনেছি। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী প্রতিভাবান বিনম্র স্বভাবের ছাত্র ছিলেন। তাঁর ছোটবেলাতেই তাঁর চরিত্রের এসব গুণাবলী লক্ষ্য করা যায়। তাঁর জীবনের ঘটনা আমি বেশী জানি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করা ও বাংলা একাডেমীর সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে তাঁকে আমি জেনেছি। তিনি কখনো উচ্চকণ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন না। জীবনের একটি স্নিগ্ধ, মনোরম ও প্রীতিপদ আবহ রচনাতেই তিনি মগ্ন ছিলেন। সৌন্দর্যপিপাসু ব্যক্তি ছিলেন তিনি। বৃহত্তর জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশার প্রতি তাঁর সমবেদনা থাকলেও তিনি জীবনে কোলাহল পছন্দ করতেন না। তাঁকে আত্মমগ্ন ব্যক্তিত্ব বলে মনে হতো। কিন্তু চরম সংকটকালে যখন জনগণের স্বার্থ বিঘ্নিত হতো তখন তিনি প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠতেন। মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী দুজনকেই একসঙ্গে কাজ করতে দেখেছি, দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বাংলাভাষা ও সাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে। একজন উৎকট আনন্দ পছন্দ করতেন, অপরজন পছন্দ করতেন স্নিগ্ধতা। এই স্নিগ্ধতাপিয়াসী ব্যক্তির জীবনের শেষমুহূর্ত, কি রকম উৎকট বিভীষিকাময় হয়েছিল তা আমাদের কল্পনার বিষয়। অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন গত দিনগুলোতে। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না, তিনি সযত্নে নিজেকে দূরে রেখেছেন রাজনীতি থেকে কিন্তু তবু তাঁকে প্রাণ দিতে হল। বাঙালী বলতে যে বিনম্র, সুরুচি ও শান্ত ভদ্র ব্যক্তিত্ব বোঝায়, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ছিলেন তারই প্রতীক। সেই বাঙালীত্বই তাঁর সবচেয়ে বড় অপরাধ। সেজন্যই তিনি প্রাণ দিতে বাধ্য হয়েছেন।

স্বাধীনতার পর এখন যখন বুদ্ধিজীবীদের লালায়িত হতে দেখি পদমর্যাদার

জন্য, ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্য তখন দুঃখ রাখার জায়গা হয় না। ছাত্রদের উচিত বুদ্ধিজীবীদের পদস্খলন থেকে রক্ষা করা, তাদের সুবিধাবাদের প্রতিরোধ করা। বুদ্ধিজীবীরা যদিও সুবিধাভোগী শ্রেণীর অংশ তবুও তাঁদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর জীবন থেকে যেন আমরা সে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী : সাহিত্যকর্ম

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

২২শে মার্চ বুধবার বিকাল চারটা

'আমার লেখার কথা যদি বলেন, তবে আমি তো অনেক বই, আর মাসিক পত্রিকা এনে দেখাতে পারব না।'[১]

আমার শিক্ষক অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ছিলেন চিরদিনই এমনি সুবিনয়ী, স্বল্পভাষী ভদ্রলোক। কদাচ উচ্চ কণ্ঠ নন, প্রগলভ নন আত্মপ্রকাশে। অথচ তিনি ছিলেন কলকাতা, বিশ্বভারতী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সেরা ছাত্র, রবীন্দ্র সাহিত্যের পরম অনুরাগী ভক্ত পাঠক, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রশ্নে আপোষহীন তীক্ষ্ণধী অধ্যাপক। দীর্ঘ দিন, এক যুগেরও বেশী সময় ছাত্র হিসেবে, সহকর্মী হিসেবে খুব কাছে থেকে তাঁকে দেখেছি। তাঁর প্রায় প্রতিটি লেখার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। আজ সেই পরিচয়সূত্রে তাঁর সেই লেখাগুলো উপলক্ষ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এভাবে, এ পরিস্থিতিতে, আমাকে এখানে উপস্থিত হতে হবে, কোনদিন তা কল্পনা করিনি—এমনকি সেই দীর্ঘ নয় মাসের ভয়াবহ দিনগুলোতে যখন স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে এক বস্ত্রে গ্রামে শহরে তাড়া খাওয়া প্রাণীর মত পলাতক জীবনে ছিলাম তখনো না। জেনেছি আমার জন্যে কী গভীর উদ্বেগ ছিল তাঁর। বস্তুতঃ শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা আর ছাত্রের প্রতি স্নেহও ছিল তাঁর চরিত্রের স্বতঃঅর্জিত স্বভাব। তাঁর শিক্ষক অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেন কি পরীক্ষক ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বা অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা কখনো বিচলিত হতে দেখিনি। তেমনি ছাত্রদের প্রতি তাঁর স্নেহও ছিল অনাবিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্কের ঐতিহ্যই হচ্ছে এই। বস্তুতঃ আমার মনে হয়, যে শিক্ষক ছাত্রকে স্নেহ করেন না, বন্ধু বিবেচনা করেন না, তিনি শিক্ষকই নন আর যে ছাত্র শিক্ষককে শ্রদ্ধা করে না, মিত্র ভাবে না সে ছাত্র নামের অযোগ্য।

---

১ লেখার উৎস: রঙীন আখর, কোয়ালিটি পাবলিশার্স, ঢাকা শ্রাবণ ১৩৭০ পৃ ৩৫

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর মিতভাষী রচনাবলীর আলোচনা আমার জন্যে কত আনন্দের কত গৌরবের হতে পারত—আজ তা কী মর্মান্তিক, কী দুঃসহ দুঃখ স্মৃতিভার!

আজ কিভাবে আমি আবেগ সংহত করি! দৃষ্টিতে নির্লিপ্তি আনি! বড় বেশী সদ্যক্ষত ভুলে কি ভাবে আমি সমালোচকের সতর্ক চোখে তাকাবো মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর মৃদুভাষী সুবিনয়ী রচনাবলীর দিকে। সদুত্তরের জন্য আমি তো যেতে পারব না এখন স্মৃতি সহচর মুহম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী বা মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর কাছে। নিষ্ঠুর নিয়তি বড় দ্রুত ছায়াপ্রদ মহী-রুহরাজী উচ্ছেদ করেছে। আমি বড় বেশী তাড়াতাড়ি প্রবীণ হয়ে যাচ্ছি। উষ্ণ স্মৃতি পেরিয়ে শীতল সমালোচনায় প্রবেশ আজ আমার জন্যে বড়ই দুরূহ। সেজন্য সকলের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী।

দুই

১৯৭১ এর মার্চ মাসের সেই উত্তাল দিনগুলোর প্রথম পর্যায়ে ৫ই মার্চ শুক্রবার, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল লেখক ও কারু শিল্পী সংগ্রাম পরিষদের যৌথ সভা।[১] অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন। উপস্থিত সকলের মত তিনিও বেশ উত্তেজিত ছিলেন, উত্তেজিত ভাবেই দু চার কথা বলে অকস্মাৎ পকেট থেকে একটা কবিতা বার করে পড়তে শুরু করলেন। বহু সভা সমিতিতে তাঁর বক্তৃতা শুনেছি, বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনর্গল আবৃত্তি করতে শুনেছি, কিন্তু কখনো নিজের লেখা কোন কবিতা পড়তে দেখিনি। আমি একটু অবাক হয়েছিলাম। কবিতাটি কাব্য মূল্যে হয়ত উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু বক্তব্য তীক্ষ্ণ। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকবর্গের উদ্দেশ্যে ছন্দোবন্ধে তিনি বলে-ছিলেন যে কবি, শিল্পী, সুকুমার শিল্পের সঠিক ইত্যাদি বলেই বাঙ্গালীর পরিচয়, কিন্তু এবার 'দেখবে কেমন বাঙ্গাল মার'। কবিতাটি কোথাও ছাপা হয়েছিল কিনা আমার জানা নেই। তার গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত যে সব মুদ্রিত অনূদিত রচনা দেখবার আমার সুযোগ হয়েছে তার মধ্যে লেখাটি দেখিনি। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের সুযোগ্য ছাত্র মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর সেদিনকার ছন্দে বক্তব্য উপস্থাপনা স্বভাবসঙ্গত না হলেও বাস্তবিক আকস্মিক ছিল না। তাঁর রঙীন আখর গ্রন্থের লেখার উৎস প্রবন্ধে কিশোর কালের কাব্য চর্চার উল্লেখ আছে।[২] ১৯৫৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যা ইত্তেফাকের কচি-কাঁচার আসরে প্রকাশিত তাঁর 'বাংলা ভাষা'ও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য:

---

১ পূর্বদেশ, ঢাকা ৬ই মার্চ ১৯৭১, 'আজকের কর্মসূচী' শীর্ষক সংবাদ দ্রষ্টব্য।

২ রঙীন আখর পৃ ৪৪।

নিজের দেশের প্রাণের ভাষা
মিঠা লাগে সবার কাছে
মায়ের মুখের সুধাবাণী
শুনতে সুখে পরাণ নাচে।
ইরান, তুরান, সাঁতাল, পাঠান
জবান কাহার কাড়তে পারো।
দেশে দেশে নানান ভাষা
তুমি তারে বুঝতে নারো,
তাই বলে তার মুখের ভাষা
বদলে দেবে গায়ের জোরে
এমন জোর নেইকো কারো
চেচাও যতোই দর্প করে। ...
মনের মধু উজাড় করে
রচে মানুষ মধুর চাকা
কথার খোপে ভাষার জালে
ধরে তারে যায় যে রাখা।
এমনি আছে ভাষা মোদের
প্রাণের প্রিয় বাংলাভাষা
হাজার বছর ধরে তাহার
খোপে খোপে মধু ঠাসা,
অশ্রু হাসি স্বপ্ন কতো
এই ভাষাতে প্রাণের ভারে
জড়িয়ে আছে নানান সুরে
সরু মোটা হাজার তারে।
চোখটি মেলে প্রথম যেদিন
দেখনু চেয়ে আলোর হাসি
মায়ের বুকে সেদিন থেকে
এই ভাষাটিই ভালবাসি।[১]

কবিতা রচনা মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর মুখ্য ছিল না, মুখ্য ছিল বাংলা ভাষাকে ভালবাসা। তাই কবিতা তিনি লিখলেও তা খুব একটা কেউ জানতে পারেনি। অথচ শুধু কবিতা নয় বেশ কয়েকটি গল্পও তিনি লিখেছিলেন—

---

১ ইত্তেফাক, ঢাকা ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬, পৃ ৪।

'সন্ধ্যা আর প্রভাত' [১], 'দিলু' [২], 'দান' [৩], 'ছায়াবিন্দু' [৪], 'শারদীয়া' [৫] ও 'পথের দাবী'।[৬]

গল্পগুলির ছাপা হয়েছিল কিছু স্বনামে, কিছু ছদ্মনামে। ছায়াবিন্দু ও পথের দাবী 'পূর্ব বাংলা' পত্রিকায় 'সব্যসাচী' ছদ্মনামে মুদ্রিত হয়। ছদ্মনামে প্রকাশ হবার কারণ ছায়াবিন্দু গল্পের কিছুটা অংশ পড়লেই সুস্পষ্ট হয়।

''নরোত্তমপুর ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট কাজেমুদ্দীন ভূঁইয়া। বৃটিশ আমলে তিনি ভাল কাজের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট হইতে সার্টিফিকেট ও মেডেল পাইয়াছেন। সেই কাজের মধ্যে ছিল ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের সময় চাউল ও বস্ত্র বিতরণ, টেষ্ট রিলিফের টাকায় রাস্তা বাঁধানো, একটি লঙ্গর খানা পরিচালনা এবং জেলা বোর্ডের সহায়তায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন। কাজগুলি তিনি খুবই যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিয়া ছিলেন সন্দেহ নাই। তার ফলে একাধারে গত পনেরো বৎসর পর্যন্ত এই ইউনিয়নের সম্মানিত প্রেসিডেণ্ট পদে বহাল আছেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার ভিতর বাড়ীর পুকুর ঘাট পাকা, মসজিদের ঘাটলা ও সামনের একটি বিস্তৃত চাতাল, টিনের বেড়াওয়ালা লাল টিনে ছাদের আটচালা বৈঠকখানা, দরওয়াজার সামনে ১৫ হাত চওড়া রাস্তা এবং ভিতর বাটির অন্দরমহলের ঘরগুলি দেওয়াল পাকা হইয়াছে মাত্র, আর বেশী কিছু তিনি করিতে পারেন নাই। অন্দরমহলের বাড়ীর এখনো পাশে ছাদ হইল না। ইহাই প্রেসিডেণ্টে সাহেবের চার পাশের উমেদার ও মোসাহেবদের আফসোস। অবশ্য তাঁহার আত্মীয়স্বজনদের মত ও কামনা অন্যরকম। কিন্তু বাংলাদেশে আত্মীয় স্বজনরাই হিংসুক ও দুরাত্মা। তাই কাজেমুদ্দীন ভূঁইয়াকে তারা দেখিতে পারে না।

পাকিস্তান হাসেল হওয়ার পর ভূঁইয়া সাহেবের নসীব বড়ই দরাজ হইয়া উঠিয়াছে। তাই অন্য লোকে পাকিস্তান পাইয়া যতনা খুশী হইয়াছে তিনি হইয়াছেন তাহার সত্তর গুণ। তিনি তাহা প্রকাশ্যেই বলেন, কেননা সত্তরগুণে বড় সওয়াব। তাই অন্যত্র যেমনই হউক প্রেসিডেন্ট সাহেবের নরোত্তমপুর ইউনিয়নের রাজধানী কচিহাটা বাজারে আজাদী উৎসব বেশ ধূমধামের সহিত প্রতিপালিত হয়।

এ বছরও উৎসবের তোড়জোড় চলিতেছে। আর পাঁচদিন পরেই ১৪ই আগষ্ট

---

১ ইমরোজ, ভাদ্র আশ্বিন ১৩৫৯

২ ইনসাফ, ১৩৫৯ পৃ ৪

৩ সংবাদ, ৩রা শ্রাবণ ১৩৬০, পৃ ৫

৪ পূর্ব বাংলা, ৫ নভেম্বর ১৯৫৬, ১৯ কার্তিক ১৩৬০, পৃ ৬

৫ পূর্ব বাংলা, স্বাধীনতা সংখ্যা ১৩৬২

৬ পূর্ব বাংলা পৃ ৬

পাকিস্তান দিবস। অথচ এখনো যথেষ্ট টাকা উঠে নাই। লোকে নানা কারণে আগের মত চাঁদা দিতে চায় না। দিতে পারেও না। চৌকিদার দফাদারগণ ইউনিয়নের সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া চাঁদা তুলিয়া বেড়াইতেছে।"[১]

স্বাধীন পাকিস্তানে গ্রামের ইউনিয়নের স্বাধীন প্রেসিডেণ্ট ও তার চৌকিদারের সাঙ্গপাঙ্গরা স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের নামে দরিদ্র নিঃস্ব সাধারণ মানুষের উপর স্বাধীনভাবে যে অত্যাচার চালাচ্ছে তারই চিত্র 'ছায়াবিন্দু'। এ গল্পে নোয়াখালী অঞ্চলের ভাষার স্বচ্ছন্দ ব্যবহার উল্লেখযোগ্য :

"লকিয়ৎ এক পা আগাইয়া আবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "এরি-ও, তোমারে আমি ধর্মের ভাই বোলাইলাম। এই তুই আঁহারে আইজগা ছড়ি দেও। আমার পোলাগার আমাশয় আইজ ক'দিন একআর কিছু অস্ত বস্ত নাই। যায় যায় অবস্থা। আইজ এই সুআরিগুণ বেচি একটু সাগু আনি দিয়ুম। আর একসের চাউল আনন লাইগবো। নুনের বয়সা তো কুলাইবোয়ে না।

চৌকিদার গর্জিয়া উঠিয়া হুকুম করিল, "আরে হালারে ধরি আন। তোর পোলা মাইয়ার কিচ্ছা হুইনবার আমাগো গরজ নাই। দি যা ইয়ানে, কি লই আইছস্, ভালা আছে, নয় ঘাড় ধরি আদায় করমু"।

লকিয়ৎও আহত অভিমানে চীৎকার করিয়া উঠিল, "কা—ও ঘাড় ধইরবা, কিয়ের লাই। আমি কি চোর না ডাকাইত, তুমি আমারে ধরি নিতা কও। ঘাড় ধইরতা কও। তোমার এত কিয়ের ক্ষেমতা!"

"বেতা নেয়াব সিরাজুদ্দৌলারে। আমি কে তুই জানসনা, দেখাইতাছি, এদিকে আনতোরে।" তাহার অনুচরেরা ইতিমধ্যে লোকটিকে হিচড়িয়া টানিয়া রাস্তায় উঠাইয়াছিল। চৌকিদার খাড়া হইয়া তাহার মুখে এক ঘুষি বসাইয়া দিয়া বলিল, "আমি তোর বাপ, বুঝলি শালা"। —কথা শেষ হইতেই ঘাড় ধরিয়া আর এক ধাক্কা। দুর্বল লকিয়ৎ রাস্তার উপর মুখ থুবড়িয়া পড়িল। তাহার সুপারিগুলি ইতিমধ্যে চৌকিদারের সাঙ্গপাঙ্গরা কাড়িয়া লইয়াছে।

লকিয়ৎ---ধুলা হইতে কাৎরাইয়া উঠিতে বিশ্রী গালাগালি করিয়া উঠিল। "হুমুন্দির পুত, তোর উপর খোদার গজব পইড়বো। তোর মারে—" অশ্লীল সব গালাগালি।"[২]

---

[১] পূর্ব বাংলা ৫ নভেম্বর ১৯৫৬, পৃ ৬

[২] পূ˝ বাংলা ৫ নভেম্বর ১৯৫৬, পৃ ৬

'পথের দাবী' গল্পের বিষয় কেরানীগিরির চাকরীতে বড় সাহেবের অত্যাচারের কথা।

'দান' এবং 'দিলু' গল্পের কেন্দ্রবিন্দু এতিম শিশু। হয়ত বা বাল্যস্মৃতি এখানে নেপথ্যচারী।

(দিলুর) "বাপ মরিয়া গিয়াছে, মাও কাছে নাই, তাই একটুখানি আদর যত্ন করি, কথাটা যতদূর সম্ভব মোলায়েম করিয়া বলি।"[১]

'দিলু' খুব সুলিখিত নয়, তুলনায় 'দান' মন্দ নয়। আহমদ মিয়া সাহেবের ছেলে মারা গেছেন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা রেখে—তাদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চায় আহমদ মিয়ার বড় ছেলে—এব্যাপারে কোরান শরীফ হাতে দিয়ে আহমদ মিয়াকে দিয়ে সে প্রতিজ্ঞা করিয়েও নিয়েছে কিন্তু এতিম নাতির প্রতি স্নেহবশে এখন সে প্রতিজ্ঞাভঙ্গে তিনি উদ্যত:

"তুমি কি বললে আমি ভুল করিয়া ওকটা কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলাম বলিয়া আমার এতিম নাতি ভাসিয়া যাইবে।" ---

অশ্রু বিকৃত কণ্ঠে বৃদ্ধ আবার বলিয়া উঠিলেন, "বউ-এর আমার সোনার বরণ কালি হইয়া গিয়াছে। বউ ছিল আমার সোনার পুত্তলি। বড় সাধ করিয়া ছেলেকে বিবাহ করাইয়া ছিলাম। সেই ছেলের আমার কত আদরের বউ। তার উপরে ঐ অসভ্য জানোয়ারটা কি অত্যাচারই না করিয়াছে। আবার বলে কিনা বিবাহ করিবে। ছিছি সভ্য সমাজে এমন কথা কে কবে শুনিয়াছে। ভাসুর হইয়া ছোট ভাই-এর বৌ সম্বন্ধে এমন কথা মুখে আনিতে আছে!"

মুহুরি বড় মিয়ার মন্ত্র কানে "লইয়াছিল। বলিল "কিন্তু নান্নুর মা যদি অন্য কাহাকেও নিকা করেন, তখন এই সব সম্পত্তি কাহার হাতে চলিয়া যাইবে, বড় মিয়া তার জন্যইতো ওকে বিবাহ করিয়া রাখিতে চাহিয়া ছিলেন, তার ছেলেমেয়েকেও বড় মিয়া নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই মানুষ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাদের তো বঞ্চিত করিতে চাহেন নাই।" আহমদ মিয়া এবার রাগে ফাটিয়া পড়িলেন, "ওই হারামজাদার কথা আমার কাছে আর একবারও বলিও না। উহার মতলব বুঝিতে আমার আর বাকী নাই। নাবালক এতিমের সম্পত্তি আত্মসাৎ করাই ওর লক্ষ্য। ও নাকি তাদের মানুষ করিবে। আরে ও একেবারে বদমাইশ। একবার ওদের সম্পত্তি হাত করিতে পারিলে ছেলেমেয়ে দুটিকে পথের ভিক্ষুক

১ ইনসাফ, ১৩৫৯, পৃ ৬

করিয়া ছড়িবে।"[১]

গল্প ছাড়াও বেতারের জন্য নাটিকা ও রবীন্দ্রসঙ্গীত সহযোগে কয়েকটি গীতিনক্সা লিখেছিলেন তিনি। ঢাকা বেতারের দ্বিতীয় নাটক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে, সোমবার ৬ই জানুয়ারী ১৯৬৪ তারিখে, অভ্যাগতদের সামনে পরিবেশিত হয় তাঁর লেখা 'আবু হোসেন' নাটক।[২]

কিন্তু কবিতা গল্প বা নাটক রচনার এই প্রয়াস বা পরিচয়কে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী কখনো মুখ্য করেননি, না আলাপে, না আলোচনায়। এ পরিচয়কে সর্বদাই তিনি রেখেছেন নেপথ্যে নিভৃতে। তাই গল্প বা কবিতা বা নাটিকা গ্রন্থাকারে প্রকাশের কোন সুস্পষ্ট উৎসাহ কখনো দেখাননি তিনি। এমন কি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ভঙ্গির কিছু রচনা সংকলন 'রঙীন আখর' প্রকাশেও তার সঙ্কোচ ছিল অপরিসীম। ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় সুবিনয়ী মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী লিখেছেন :

> "এই রচনাগুলি আমার নিতান্তই নিভৃত চিত্তের আলাপন। অন্য গুরুতর কাজের অবসর মুহূর্তে নিজের মনকে নিয়ে লেখা করতে করতে লেখা। কোন বিশেষ ভাব বা তত্ত্ব প্রকাশ এ রচনাগুলির উদ্দেশ্য নয়। এর অধিকাংশ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তখন কোন কোন রসিক পাঠক পাঠিকা এদের প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু তবু বই আকারে প্রকাশ করা সম্পর্কে আমার মনে খুবই সঙ্কোচ ছিল। একান্ত ব্যক্তি অনুভূতিনির্ভর রচনা, সে কবিতাই হোক, কি প্রবন্ধই বাইরে কি সমাদর লাভ করবে সে বিষয়ে লেখকের মনের সঙ্কোচ কিছুই ঘোচে না।"[৩]

'রঙীন আখরে' সাহিত্য ও সমাজ এবং নিজের সম্পর্কে সহজ তির্যক মন্তব্য বর্তমান। 'রুচি' প্রবন্ধটির কথাই ধরা যাক। পরিচিত এক ভদ্রমহিলার জন্মদিনে যেতে হবে, উপহার কেনবার মত খুব বেশী পয়সা নেই পকেটে, প্রথমে ভাবলেন ফুল নিয়ে যাবেন কিন্তু নিউমার্কেটে কাগজের ফুল থাকলেও ফুলের দোকান নেই। তাই অনেক ভেবেচিন্তে চকলেটের অভাবে কিছু টফি, একটা প্যারিসের গন্ধরাগ আর এক শিশি নখ পলিশ কিনলেন তিনি।

> "এতেই আমার পকেট একেবারে ফাঁকা রমনার মাঠ হয়ে গেল। আমার মূলধনের মধ্যে সুন্দরীকে দেওয়ার মত আর কিছু পাওয়া গেল না।"

---

১ সংবাদ, ৩রা শ্রাবণ ১৩৬০, পৃ ৫

২ ইত্তেফাক, জানুয়ারী ৭, ১৯৬৪

৩ রঙীন আখর, ভূমিকা।

তারপর, "আমার সর্বস্বের বিনিময়ে কেনা উপহার নিয়েতো গেলাম ভদ্রমহিলার বৈঠকখানায়। বহু লোকের সমাগম, তার মধ্যে বিচিত্র বর্ণ এবং গনজের মহিলাই বেশী। পকেট থেকে আমার জিনিসগুলি তো সঙ্কোচে বার করতেই পারিনা। এক ফাঁকে গৃহকর্ত্রী ভদ্রমহিলার কাছে গিয়ে পকেটে হাত দিলুম, প্রথমেই বেরিয়ে এল টফির বাক্সটা। ওটা হাতে দিতেই ভদ্রমহিলার মুখের যা ভাব হল, তাতে আমার মুখখানি পোড়া বেগুনের মতই চুপসে গেল। তবু সাহসে ভর করে বাকি শিশি দুটো বার করলাম। নখ রঞ্জনীর শিশিটার ওপর চোখ পড়তেই একটু মুখ টিপে হাসলেন, হাতে নিয়ে যেই বললেন, "দেখেছিস তোরা, 'সুইট', অমনি ঠিক এক ঝাঁক মেয়ে যেন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাকি সেন্টের শিশিটা এই গোলমালে আমি কোন মতে ভদ্র মহিলার হাতে গুজে দিয়ে একপাশে কেটে পড়লুম।"[১]

প্রবন্ধের শেষে লেখক প্রশ্ন তুলেছেন, "সভ্যতা কি, রুচি কি, আমার রুচিটাই কি সত্যি, না অধিকাংশ লোক যেদিকে ঝুকেছে সেটাই সত্যি। পোষাক পরিচ্ছদ, হালচাল, আহার বিহারে আমরা কাদের অনুকরণ করছি—আমাদের আদর্শই বা কি, কিম্বা আদৌ আমাদের কোন আদর্শ আছে কিনা।"[২]

এ গ্রন্থে আমাদের সাহিত্য প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য: "আমাদের সাহিত্যের আসরে হট্ট গোলটা যেন একটু বেশী। কোলাহল প্রাণবন্যার লক্ষণ সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেকক্ষণ সেটা চালানো নিরাপদ নয়। হাট ভেঙ্গে বাড়ী গেলেই শান্তি, হিসেব মিলিয়ে নেবারও সুবিধে। যে যাই বলুক আমার তো মনে হয়, হাটের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে ভাব আসতে পারে, কিন্তু ভাবনা করা চলে না। তাতে পকেট-মাররূপ বিপত্তির খুবই সম্ভাবনা থাকে।---সভাগৃহে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।---অনেক ক্লাব ও সমিতিকে সাহিত্যের আঁতুড় ঘর মনে করা হয়, কিন্তু আমি তাদের সাহিত্যের কুস্তির আখড়া বলেই অভিহিত করতে চাই। আঁতুড় ঘরে গোলমাল চলেনা, তবে কুস্তির আখড়ায় শক্তির সঞ্চয় করাটা একরকম ভালই।"[৩]

সাহিত্যে কি জীবনে হৈচৈ কি কোলাহল তাঁর পছন্দ নয়। তিনি পছন্দ করেন ধৈর্য ধীরতা, কেননা তারই মধ্যে তো 'সৃষ্টির অবসর'। অথচ নিজের জীবনে, দেশের এক শ্বাসরোধকারী রাজনৈতিক পরিবেশে তিনি কি কখনো

১ রঙীন আখর, পৃ ২৯
২ ঐ,
৩ ঐ, পৃ ৩, ৪

লাভ করেছিলেন প্রয়োজনীয় প্রশান্তি ও অবসর।

তিন

রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর অধ্যয়ন, অধ্যপনা, চিন্তা ও চেতনার এক প্রধান অংশ। এর প্রত্যক্ষ ফসল তাঁর গ্রন্থ 'রবি পরিক্রমা'।[১] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন:

> "স্নেহভাজন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র, এবং রবীন্দ্রনাথের পরিবেষ্টনীর মধ্যে দীর্ঘকাল পালিত। আমি মনে করি তাঁর এই রবি পরিক্রমা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার নানাদিকে আলোকপত করতে সুন্দররূপে সক্ষম হয়েছে।"

'রবি পরিক্রমা' রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত বারোটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলি হচ্ছে: প্রস্তাবনা: রবীন্দ্রকাব্য পাঠ,[২] রবীন্দ্রনাথের পার্থিবতা,[৩] পদ্মা আর কোপাই,[৪] পূর্ব পাকিস্তানের নিসর্গ সংস্থান ও রবীন্দ্রনাথ,[৫] রবীন্দ্রনাথের সার্বজনীনতা,[৬] রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বমৈত্রী[৭] রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দুমুসলিন সম্পর্ক[৮] শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী,[৯] রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা,[১০] রবীন্দ্রনাথের ধর্ম,[১১] মরমী সাধক রবীন্দ্রনাথ,[১২] এবং রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাভাষা[১৩]।

এর বাইরেও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'রবীন্দ্রনাথ ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা'[১৪]।

---

১ রবি পরিক্রমা, কোয়ালিটি পাবলিশার্স, ঢাকা, জুলাই ১৯৬৩

২ প্রথম প্রকাশ, অংশত: দৈনিক মিল্লাত ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১

৩ প্রথম প্রকাশ, নয়া দুনিয়া আজাদী সংখ্যা ১৯৫৬

৪ প্রথম প্রকাশ, সোনার বাংলা ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০

৫ প্রথম প্রকাশ, ছাত্রী হল বার্ষিকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০-৬১
পুনঃ প্রকাশ, পূর্বালী ঢাকা, ৫ই মে ১৯৬৬ পৃ ৩

৬ প্রথম প্রকাশ, প্রথমটি ইত্তেফাক, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮
দ্বিতীয়টি সওগাত শ্রাবণ ১৩৬১

৭ প্রথম প্রকাশ, ইত্তেফাক, ২৬ বৈশাখ ১৩৬১ (বিশ্বকবি স্মরণে)

৮ প্রথম প্রকাশ, সমকাল,রবীন্দ্র জন্ম বার্ষিকী সংখ্যা বৈশাখ ১৩৬৮

৯ প্রথম প্রকাশ, ইমরোজ, বৈশাখ ১৩৬০

১০ এই গ্রন্থেই প্রথম প্রকাশ

১১ প্রথম প্রকাশ, অংশত: সমকাল, আষাঢ় ১৩৭০

১২ প্রথম প্রকাশ অংশত: মহিলা ১৪ই মে ১৯৬২

১৩ প্রথম প্রকাশ, সুরঙ্গমা, কলিকাতা মে ১৯৬১

১৪ ইত্তেফাক, রবীন্দ্র সংখ্যা ১৩৭৬

রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক তাঁর প্রবন্ধগুলোকে তিনটে ভাগে ভাগ করা যায়। একঃ রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠের পরিচয়মূলক, দুই: তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথের যোগ্য সমাদর প্রতিষ্ঠার আন্দোলনমূলক এবং তিন: রবীন্দ্র প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্র প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ, যেমন 'শান্তিনিকেতন'। এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার খুব প্রয়োজন নেই।

প্রথম ধরনের অর্থাৎ রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয়মূলক প্রবন্ধ গুলোতে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী শান্তিনিকেতনের বিনীত ছাত্র। 'রবীন্দ্রকাব্য পাঠ', 'রবীন্দ্রনাথের পার্থিবতা', 'রবীন্দ্রনাথের সার্বজনীনতা,' বা 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা ভাষা' প্রবন্ধে সেই কারণে দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র অনুপস্থিত। এ সব প্রবন্ধে রবীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতি,[১] রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতার[২] অন্তরালবর্তী জীবন ও মর্ত্যপ্রীতি,[৩] সৌন্দর্য চেতনা[৪] রূপ অরূপ, সীমা অসীম[৫] বা ভগবৎ প্রেম,[৬] মৃত্যুর আলোকে রবীন্দ্রনাথের মর্ত্যজীবন প্রীতি,[৭] রবীন্দ্র-কবিচিত্তের বহির্মুখী জাগরণ, বিশ্ববোধ, আন্তর্জাতিকতা বোধ,[৮] জীবন দেবতার সুন্দর মঙ্গলময় রূপ,[৯] বা রবীন্দ্রনাথের ভাষার সঙ্গীতময়তা ও সাংকেতিকতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ,[১০] রবীন্দ্র সাহিত্য প্রসঙ্গে প্রচলিত সাহিত্য চিন্তা অনুসরণের নির্দেশক। একথা স্মরণ করেই হয়ত স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ে তিনি নিজেকে রবীন্দ্র সাহিত্যের 'সাধারণ সাহিত্য রসিক' বলে উল্লেখ করেছেন, বলেছেন—"আমরা যারা উপর উপর রবীন্দ্রকাব্যের রঙ্গীন পরাগই শুধু গায়ে মাখলুম কিম্বা হাত বাড়িয়ে তার শীতল স্পর্শটুকু পেয়ে খুশী হয়ে উঠলুম, তারাও ধন্য।"[১১]

ধন্য বটে, তবে কোন ধন্যবাদ বুঝি কালের মধ্যে রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠকের প্রশান্তি তাঁর বিনষ্ট হয়েছে। তৎকালীন পূর্ব বাংলায় বাঙ্গালী সংস্কৃতি বিরোধী শক্তি পাকিস্তানী শাসকবর্গের সক্রিয় সহায়তায় প্রবল হয়ে ওঠে এবং তারা

---

১ রবি পরিক্রমা পৃ ৪
২ ঐ, পৃ ৫
৩ ঐ, পৃ ৭
৪ ঐ, পৃ ৮
৫ ঐ, পৃ ৯
৬ ঐ, প ১৩
৭ ঐ, পৃ ২০-২১
৮ ঐ, পৃ ৪৫
৯ ঐ, পৃ ১৩০, ১৩৮
১০ ঐ, পৃ ১৮৯
১১ ঐ, পৃ ৩

হিন্দু বলে রবীন্দ্র সাহিত্য পরিত্যাজ্য এ মত প্রচার শুরু করে। অলস মেজাজ ত্যাগ করে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী অপরাপর মুক্তবুদ্ধি বুদ্ধিজীবীর মতই বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অপরিহার্যতা প্রমাণে দ্রুত এগিয়ে আসেন। তিনি লেখেন :

> "রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ছিলেন এই ভুল ধারণাটা যত তাড়াতাড়ি বিলুপ্ত হয়—ততই তাকে বুঝতে সুবিধে হবে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়-ভুক্ত এবং এই ব্রাহ্মদের সঙ্গে হিন্দুদের আকাশ পাতাল তফাৎ। ব্রাহ্মরা পৌত্তলিকতার ভয়ানক বিরোধী এবং এক নিরাকার ভগবানে বিশ্বাসী। কাজেই প্রতিমা পূজা, অর্চনা এ সব তাদের নয়। হিন্দুদের তুলনায় তারা বহু সংস্কারমুক্ত।[১]

'রবীন্দ্রনাথের ধর্ম' প্রবন্ধে এ মন্তব্য আরো স্পষ্ট করা হয়েছে :

১. রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের এই দুই দিক আমরা দেখতে পাই, একটি হচ্ছে মননের দিক, অপরটি সাধনার দিক। মনন বা উপলব্ধির দিক থেকে ধর্মকে তিনি দেখেছেন—একটি আদর্শ রূপে, যার ভিত্তি-ভূমি হচ্ছে এক উদার মানবিকতা—যাকে তিনি অভিহিত করেছেন, 'মানুষের ধর্ম' বলে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধর্ম কেবল শুষ্ক তত্ত্বমাত্র নয় আর শুধু দার্শনিক আলোচনার মধ্যেও তা পর্যবসিত নয়। রবীন্দ্র-নাথ মর্ত্যপ্রেমিক কবি, তিনি জীবনরসের কবি। তাঁর ধর্মসাধনাও তাই জীবনের এই রসানুভূতি থেকে বিশ্লিষ্ট নয়, বরং তারই সঙ্গে গভীরভাবে অনুস্যূত।[২]
২. রবীন্দ্রনাথ তো বলেছেন, কোনো বাঁধা ধর্মমত তাঁর নয়। তাঁর ধর্মমত তাঁরই জীবনের অভিজ্ঞতার ভেতর থেকে উদ্ভিন্ন হয়ে বেড়ে উঠেছে।[৩]

'রবীন্দ্রনাথের সার্বজনীনতা' প্রবন্ধে তিনি পুনরায় ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা :

> রবীন্দ্রনাথের স্বধর্ম অর্থ বিশেষ কোন জাতীয় বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়। রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ তাঁর বিশ্ববোধ দ্বারাই অনুপ্রাণিত। সব মানুষের ধর্মই ছিল তাঁর ধর্ম। তিনি যা ধর্মবিশ্বাস বলে গ্রহণ করেছিলেন তা সব ধর্মেরই অন্তর্গত, সব ধর্মের মূল বস্তু।---কাজেই কোন

১ রবি পরিক্রমা পৃ ৫৪
২ ঐ পৃ ১৬৭
৩ ঐ পৃ ১৭২

ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গেই তাঁর বিরোধ থাকতে পারেনা। মহত্ত্ব লাভের জন্য সভ্য মানুষ মাত্রেরই যা আচরণীয় একমাত্র তাই রবীন্দ্রনাথের ধর্ম—এর বেশি কিছু নয়, কমও নয়। মানুষের পক্ষে ন্যূনতম অথচ মৌলিক এই ধর্মবোধের তিনি নাম দিয়েছেন মানুষের ধর্ম। এর বাইরে বা অতিরিক্ত যা কিছু সে ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে অবান্তর।[১]

'মরমী সাধক রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের ওপর 'পারসিক সুফী কবিদের প্রভাবের' কথা বলেছেন।[২] অন্যদিকে 'পূর্ব পাকিস্তানের নিসর্গ সংস্থান ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে মানসী, সোনার তরী, গল্পগুচ্ছ ও ছিন্নপত্র থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন রবীন্দ্র সাহিত্যে পূর্ব বাংলার প্রকৃতির 'অনপনেয় স্বাক্ষর'।[৩] অতঃপর তিনি 'রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দুমুসলমান সম্পর্ক' বিবেচনা করে সুস্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করেছেন রবীন্দ্রনাথের অসাম্প্রদায়িকতা।[৪] এবং অবশেষে 'রবীন্দ্রনাথ ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে আরো কিছু মন্তব্য করেছেন।[৫] বলাবাহুল্য, এ সব প্রবন্ধে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী শান্তিনিকেতনের ছাত্র মাত্র নন এখানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের যুক্তিবাদী অধ্যাপক।

চার

রবীন্দ্র প্রসঙ্গে যে আক্রমণ প্রথমে সীমাবদ্ধ ছিল দ্রুত তা সামগ্রিকভাবে বাঙালী সংস্কৃতির উপর এসে পড়ে। মুক্তবুদ্ধি ও প্রগতিশীল তরুণ বুদ্ধিজীবীদের ওপর স্বাভাবিক কারণে প্রতিরোধের দায়িত্ব স্বতঃ অর্পিত হয়। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী বাংলাদেশ কি, বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য কি, এ-সব প্রসঙ্গ আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা 'বাংলা সাহিত্যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতা' প্রবন্ধে[৬] তিনি প্রাচীনতম কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ঐতিহ্যকে পূর্ব বাংলার সাহিত্যের ঐতিহ্য বলে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করলেন।[৭]

---

১ রবি পরিক্রমা পৃ ৫১

২ ঐ পৃ ১৮৪

৩ ঐ পৃ ৩৪-৪৩

৪ ঐ পৃ ৬৩-৯৩

৫ ইত্তেফাক, রবীন্দ্রস্মৃতি সংখ্যা ১৩৭৬

৬ সাহিত্যে নবরূপায়ণ, ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স ১৩৭৬, পৃ ৯৩-১১৪

৭ ঐ পৃ ১১৩

'সাহিত্যের নবরূপায়ণ' গ্রন্থে সংকলিত বিভিন্ন বিষয়ক ১৪টি প্রবন্ধের যোগ-সূত্র এখানে। এ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'মানবতার কবি নজরুল', 'মুক্তবুদ্ধির অগ্রদূত বিদ্যাসাগর', 'মধুসূদনের কবিমানস' এবং 'শিশু সাহিত্যিক জসীমউদ্দীন' প্রবন্ধ গুলিতে সামাজিক পটভূমিতে সাহিত্য বিচারের প্রচেষ্টা আছে। এ ক্ষেত্রে বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর প্রবন্ধটির নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

> "বিস্মিত হয়ে ভাবি, বাঙলা দেশের প্রথম গ্রাজুয়েট ইংরেজী শিক্ষিত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র হলেন গোঁড়া প্রাচীনপন্থী আর সংস্কৃত কলেজে শিক্ষিত, তথাকথিত টুলো পণ্ডিত, দরিদ্রসন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হলেন আপোষহীন সংস্কারপন্থী এবং অক্লান্ত বিপ্লবী কর্মী। এটা কেমন করে সম্ভব হল?[১]

কিন্তু এ গ্রন্থের বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হচ্ছে 'সাহিত্যের নবরূপায়ণ', 'আমাদের সাহিত্যের ধারা', 'বাংলা সাহিত্যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতা' এবং 'সংস্কৃতির সংকট।'

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান—মুসলিম সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং মুসলমান সাহিত্যিকদের অবদান কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি বিবৃত করেছেন। বলেছেন—বাংলাদেশ নামও মুসলমানদের দেয়া—

১. মুসলমান তুর্কী বিজেতাগণই এই সমুদয় অঞ্চলকে এক শাসনাধীনে আনয়ন করে একত্রে, 'সুবে বাংলা' বলে অভিহিত করতে লাগলেন। সেই থেকে এই সমুদয় অঞ্চলের বাঙ্গালমুলুক বা বাংলা দেশ নাম হয়।[২]
২. ইদানিং কালের বঙ্গদেশ আর প্রাচীন বঙ্গদেশ এক নয়, প্রাচীনকালে বঙ্গদেশ বলতে যে আঞ্চলটা বোঝাত সেটা পূর্ব বাংলারই অংশ মাত্র। বর্তমান পূর্ববঙ্গ প্রদেশ বা পূর্ব পাকিস্তানের সেই প্রাচীন বঙ্গের সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে গৌড় এবং কামরূপের খানিকটা অংশ। কাজেই আমরা পূর্ব বঙ্গবাসীরাই হলাম আদি বঙ্গদেশ, বা যথার্থ বঙ্গভূমির অধিকারী।[৩]
৩. আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতিও উদ্ভূত হবে আমাদের দেশের মাটি থেকে। বাংলাদেশের লোক, এর জীবন এবং পারিপার্শ্বিকতা নিয়েই গড়ে উঠবে আমাদের সাহিত্য।[৪]

---

১ সাহিত্যের নবরূপায়ণ, পৃ ৯০
২ ঐ পৃ ৯৯
৩ ঐ পৃ ১
৪ ঐ পৃ ১৮

৪. আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা তর্ক উঠেছিল, আমাদের সাহিত্য প্রধানতঃ বাঙ্গালী হবে কি মুসলমানী হবে, এর আদর্শ মূলতঃ লৌকিক হবে কি ধর্মীয় হবে। এ নিয়ে কিছু বিতর্ক, দলাদলি এমন কি ব্যক্তি-গত আক্রোশ এবং বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই তর্ক এখনও পুরোপুরি মীমাংসা হয়েছে বলে মনে হয়না। আমিও এখানেই সে তর্কের মীমাংসা করে দেবার ধৃষ্টতা রাখিনে বা সে তর্কে যেতেও আমি প্রস্তুত নই। এখানে শুধু আমি এটুকু বলতে পারি যে, আমাদের সাহিত্যের আদর্শ 'সাহিত্যিক'ই হবে অন্য তর্ক তার পক্ষে অবান্তর। সাহিত্যের উদ্দেশ্য 'সাহিত্য' হয়ে ওঠা, তার মধ্য দিয়ে সত্য এবং পরিপূর্ণতার ছবিকে ফুটিয়ে তোলা—তা যদি সে পারে, অর্থাৎ সত্যিকার সাহিত্য যদি তা হয়ে ওঠে, তবেই তার উদ্দেশ্য সার্থক এবং অন্য কিছু না হলেও তার চলে যাবে। বাঙালিত্ব নিয়ে সাহিত্য হতে পারে, ইসলামী জীবনা-দর্শ নিয়েও হতে পারে, উপকরণ হিসেবে দুইই সমান গ্রাহ্য। তবে কিনা তা সাহিত্য হয়ে ওঠেছে কিনা দেখতে হবে তাই, বিষয়বস্তু বা ভাবাদর্শ যাই হোক না কেন। আর সাহিত্য হিসেবে তাকে সত্য করে তুলতে হলে তার সঙ্গে সত্য পরিচয় থাকা দরকার। অর্থাৎ বিষয়বস্তু সম্পর্কে লেখককে প্রত্যক্ষভাবে এবং তীব্রভাবে অবহিত হতে হবে। যে বিষয়ে লেখকের নিবিড় উপলব্ধি নেই তাকে তিনি সত্য এবং সজীব করে তুলতে পারেন না। আমাদের লেখকগণকেও বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই।[১]

৫. আজ যদি বিদ্বেষবশতঃ আমরা কালিদাস সেক্সপীয়রের সাহিত্যকে বর্জন করি তবে কি আমরা নিজেদেরকেই বঞ্চিত করব না।[২]

৬. ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আমাদের সাহিত্যিকদের মধ্যে যেন কোনো বাড়া-বাড়ি না দেখা যায়। ফারসী উর্দু শব্দের প্রাবল্যে ভাষাকে তারা আড়ষ্ট ও অর্থহীন করে ফেলেন—এটা যেমন আমরা চাইনে, তারা আবার মুসলমানী (যেমন ছিল এককালে হিন্দুয়ানী) শুচিতা রক্ষা করতে গিয়ে সমাজ ও সাহিত্যকে বিশ্ব পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগবিহীন ও গতিশূন্য করে ফেলেন—এটাও পূর্ববঙ্গের সাহিত্যের উন্নতিকামী কেউ চাইতে পারেন না। কেবলি নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে আমরা যেন হীনমন্যতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয় না দেই। পরন্তু

---

১ সাহিত্যের নবরূপায়ণ, পৃ ২৭

২ ঐ পৃ ১৯

নিজেদের রক্তের সঙ্গে যা ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত, কোনো মিথ্যা অভিমান এবং গোঁড়ামী বশতঃ সেই সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিলে আমরা ভয়ানক ভুল করব। নিজের জায়গায় শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আমরা দ্বিধা ও পক্ষপাতহীন মুক্তমনে পরের কাছ থেকে গ্রহণ করব। অতীতের ধারাবাহী উৎস থেকে যোগশূন্য হ'য়ে কোনো সংস্কৃতির প্রবাহই জীবন্ত থাকতে পারেনা। বাংলা সাহিত্যের দিকপ্লাবী অমৃতনির্ঝর আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য এর থেকে নবীন প্রাণাবেগে উচ্ছ্বিত হয়ে উঠবে নবতম ধারা—পূর্ব বাঙলার সাহিত্য, কিন্তু যে উৎস থেকে সে উৎসারিত তার সঙ্গে যোগরক্ষা করতেই হবে।[১]

'আদর্শ সাহিত্য' কি হবে ব্যাখ্যা করতে যেয়ে তিনি বলেছেন—

আমাদের দেশেও সেই সাহিত্য চাই---যা মনের সঙ্গে মনের ঘটাবে মিলন; বিদ্বেষহীন হৃদয় বন্ধনের মধ্য দিয়ে এনে দেবে সব মনের মুক্তি। চাই সেই সাহিত্য যা আমাদের স্থানীয় মনকে বিশ্বমনের নিকট উপস্থিত করবে; স্থানকালকে চিরন্তনের সঙ্গে যুক্ত করবে; আর এমনি মন দেয়ানেয়ার মধ্য দিয়ে যে সাহিত্য সহৃদয়তা এবং সম্প্রীতির নূতন তোরণ দ্বার উন্মোচন করবে সে সাহিত্যই সার্থক বিশ্বসাহিত্য।[২]

বলেছেন---

আমার সঙ্গে মতের অমিল কারুরইহবে না এ আশা করিনে; কিন্তু কারো যদি ভিন্নমতই থাকে, তিনি আমাকে সোজাসুজি দুশমন আখ্যায়িত না করে তাঁর মতটাও যুক্তি প্রমাণসহ উপস্থিত করবেন বলেই আশা করি।[৩]

কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। বিরুদ্ধ পক্ষ সহযাত্রীদের সঙ্গে তাকেও 'দুশমন' বলেই চিহ্নিত করেছে। মতের অমিলকে তারা আদৌ সহ্য করতে চায়নি। পরিণামে আলবদরের শিকার হলেন তিনি। তাঁর অন্তিম যাত্রার পরবর্তী বর্ণনা তিনি নিজেই লিখে রেখে গেছেন—

দূর থেকে চেয়ে রইলাম শুধু। তার মুখও আমরা শেষবারের মত দেখিনি।---আমরা আপন হৃদয়ের দিকে তাকিয়েই দেখতে পেলাম সে মুখ। আমাদের হৃদয়ের অক্ষর পটে অশ্রুজলের রেখায় রেখায় সে মুখখানি আঁকা হয়ে আছে।[৪]

---

১ সাহিত্যের নবরূপায়ণ, পৃ ২১-২২

২ আমাদের সাহিত্য, ঐ পৃ ১৫

৩ ঐ, পৃ ১৭

৪ রঙীন আখর, পৃ ৫৫

পরিশিষ্ট

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর রচনাসমূহের তালিকা

প্রকাশিত গ্রন্থ

১. বাংলা বানান ও লিপি সংস্কার ; বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, চৈত্র ১৩৬৮
২. রঙীন আখর, কোয়ালিটি পাবলিশার্স, ঢাকা, শ্রাবণ ১৩৭০
৩. Colloquial Bengali (for non-Bengali learners), Bengali Academy, Dacca 1963
৪. রবি পরিক্রমা, কোয়ালিটি পাবলিশার্স ঢাকা, জুলাই ১৯৬৩
৫. সাহিত্যের নবরূপায়ণ, মওলা ব্রাদার্স ঢাকা, আশ্বিন ১৩৭৬

স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থ

১. বাঙলা ব্যাকরণ (পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী)
২. বাঙলা ব্যাকরণ (সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী)

অপ্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ

১. Some supra-segmental Phonological Features of Bengali, SOAS, October 1959.

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রচনাসমূহ (কালানুক্রমিক)

১.	বাঙলা ছন্দ	কবিতা	আশ্বিন	১৩৫০
২.	গান্ধী স্মৃতি	দেশ	গান্ধীসংখ্যা	১৯৪৮
৩.	বাঙলা ছন্দের কথা	এলান	জুন ১ম	১৯৫২
৪.	সাহিত্যের আঙ্গিক গীতিকাব্য	ঐ	ডিসেম্বর ২য়	১৯৫২

৫.	মহুয়া	এলান	জুন ১ম	১৯৫৩
৬.	পদ্মা আর কোপাই	সোনার বাংলা	২রা জ্যৈষ্ঠ	১৩৬০
৭.	সন্ধ্যা আর প্রভাত (গল্প)	ইমরোজ	ভাদ্র আশ্বিন	১৩৫৯
৮.	শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী	ঐ	বৈশাখ	১৩৬০
৯.	জেনানা ফাটক (সমালোচনা)	ঐ	শ্রাবণ-ভাদ্র	১৩৬০
১০.	বাঙলা ভাষার কথা	ঐ	মাঘ—ফাল্গুণ	১৩৬০
১১.	বিশ্বকবি স্মরণে	ঐ	বৈশাখ	১৩৬১
১২.	কাব্যে চলিত ভাষা	যান্ত্রিক	পৌষ	১৩৫৯
১৩.	কোনঠাসা গণতন্ত্র	সওগাত	পৌষ	১৩৫৯
১৪.	সংস্কৃতি সংকট	ঐ	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	১৩৬০
১৫.	পুঁথি সাহিত্যের শুরু	ঐ	আষাঢ়-শ্রাবণ	১৩৬০
১৬.	বুদ্ধির মুক্তি	সওগাত	ফাল্গুণ	১৩৬০
১৭.	রবীন্দ্রনাথের সার্বজনীনতা	ঐ	শ্রাবণ	১৩৬১
১৮.	গুলে বাকাওলী (সমালোচনা)	মাহেনও	ভাদ্র	১৩৬০
১৯.	প্রবন্ধ সাহিত্য	স্পন্দন	আশ্বিন-কার্তিক	১৩৬১
২০.	Rabindra Saptaha-Visva Bharati	News	Sept.	1948
২১.	Santiniketan-this year	Pakistan Observer	3 Feb.	1952
২২.	Improvement of our city	,,	26 Aug.	1954
২৩.	সাহিত্যে দ্বন্দ্ব	সংবাদ	২৩শে নভেম্বর	১৯৫২
২৪.	ছাত্ররা পরীক্ষায় ফেলকরে কেন	ঐ	৯ই চৈত্র	১৯৫২
২৫.	আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার (চারু ও কারু শিল্পের স্থান)	ঐ	১৪ই আষাঢ়	১৩৬০
২৬.	ভাষা ও অক্ষর	ঐ	৩রা জ্যৈষ্ঠ	১৩৬০
২৭.	বাঙলা ভাষার অক্ষর	ঐ	২১শে ফেব্রুয়ারী	১৯৫৪
২৮.	নজরুলের সাম্প্রতিক অবস্থা	ঐ	২৩শে ভাদ্র	১৩৬০
২৯.	প্রাইভেট পরীক্ষার ব্যবস্থা	ঐ	২ বৈশাখ	১৩৬১
৩০.	দান (গল্প)	ঐ	৩রা শ্রাবণ	১৩৬০
৩১.	দিলু (গল্প)	ইনসাফ		১৩৫৯
৩২.	উৎসব	মিল্লাত	ঈদসংখ্যা	১৩৫৯
৩৩.	পাক-ভারত সম্প্রীতি	ঐ	১২ই জ্যৈষ্ঠ	১৩৬০
৩৪.	বাঙলা ভাষা	ঐ	৯ই ফাল্গুণ	১৩৬০
৩৫.	গণতন্ত্রের পক্ষে একধাপ	মিল্লাত	২১শে চৈত্র	১৩৬০

৩৬.	গণতন্ত্রের পক্ষে একধাপ	মিল্লাত	২২শে চৈত্র	১৩৬০
৩৭.	পহেলা বৈশাখে ছুটি	ঐ	২৪শে চৈত্র	১৩৬০
৩৮.	রবীন্দ্রকাব্য পাঠ	ঐ	২রা জ্যৈষ্ঠ	১৩৬১
৩৯.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা সিলেবাস	আজাদ	১৭ই জ্যৈষ্ঠ	১৩৬০
৪০.	পড়ায় দুঃখ	ঐ	২৬শে পৌষ	১৩৬০
৪১.	বাঙলা ভাষা ও ফিরোজ খান নুন	যুগের দাবী	১১ এপ্রিল	১৯৫৬
৪২.	বাঙলা সাহিত্যের মুসলমানদের দানের একদিক	পূর্ববাংলা	২৯শে অক্টোবর	১৯৫৩
৪৩.	ছায়াবিন্দু (গল্প)	ঐ	৪ নবেম্বর	১৯৫৬
৪৪.	নজরুল ইসলাম	ঐ	৩রা জুন	১৯৫৪
৪৫.	আমার দেশ	ঐ	১৪ই আগষ্ট	১৯৫৪
৪৬.	লেখার ইতিবৃত্ত	পাকিস্তান	২৮শে জ্যৈষ্ঠ	১৩৬১
৪৭.	বিশ্বকবি স্মরণে	ইত্তেফাক	২৬শে বৈশাখ	১৩৬১
৪৮.	আমাদের সাহিত্য	ঐ	১৯শে জ্যৈষ্ঠ	১৩৬১
৪৯.	গীতিকাব্য	সওগাত	পৌষ	১৩৬১
৫০.	নববর্ষ উৎসব	ইত্তেফাক	২১শে এপ্রিল	১৯৫৫
৫১.	মানবতার সংকট	স্পন্দন		
৫২.	আয়না বিবি : পূর্ববঙ্গের লোকগীতিকা	বই		
৫৩.	সাহিত্যের নবরূপায়ণ	পাকিস্তানী খবর	ঈদ সংখ্যা	১৯৫৫
৫৪.	বাঙলা বানানে অরাজকতা	ইত্তেফাক	স্বাধীনতা সংখ্যা	১৩৬২
৫৫.	শিশু মনের যাদুকর জসীমউদ্দীন	ইত্তেহাদ	ঐ	১৩৬২
৫৬.	শারদীয়া (গল্প)	পূর্ব বাংলা	স্বাধীনতা সংখ্যা	১৩৬২
৫৭.	রুচি			
৫৮.	বিদ্যাসাগর : মুক্তবুদ্ধির অগ্রদূত	সওগাত	অগ্রাহায়ণ	১৩৬১
৫৯.	ফুল	সোনার বাংলা	২০ নবেম্বর	১৯৫৫
৬০.	রাষ্ট্রীয় আদর্শ	ইত্তেফাক	৩রা জানুয়ারী	১৯৫৩
৬১.	আমাদের শিক্ষা সমস্যা	ইত্তেফাক	৯ই জানুয়ারী	১৯৫৬
			১৬ই জানুয়ারী	১৯৫৬

সভাপতির ভাষণ

মযহারুল ইসলাম

অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান-এর প্রবন্ধটি সুলিখিত। শিক্ষকের প্রতি প্রবন্ধকারের গভীর শ্রদ্ধা এতে বিধৃত।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী সৃষ্টিশীল লেখক হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন না ; ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের আলোচনায় চৌধুরী সাহেবের প্রতিভার এদিকটিও উদ্‌ঘটিত হয়েছে।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ছিলেন বিনয়ী ভদ্রলোক। রবীন্দ্রসাহিত্য ছিল তাঁর অনুরাগের বিশিষ্ট কেন্দ্র। তিনি পাকিস্তান আমলের বাঙালী সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের অগ্রণী ছিলেন। ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তাঁর এই দ্বৈত ভূমিকাকে 'শান্তিনিকেতনের বিনীত ছাত্র ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক' বলে নির্দেশ করেছেন। এটি যথার্থ বলে মনে করি। শান্তিনিকেতনের ছাত্র মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী বাঙালী সংস্কৃতির প্রশ্নে আপোষহীন।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন দিক এই প্রবন্ধে সুচারুরূপে আলোচিত হয়েছে। আলবদর ঘাতকদের হাতে নিহত না হলে স্বাধীন বাংলাদেশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর অবদানে আরো সমৃদ্ধ হতে পারত।

আনোয়ার পাশার জীবনকথা

ওয়াকিল আহমদ

২৩শে মার্চ বৃহস্পতিবার বিকাল চারটা

মুহম্মদ আনোয়ার পাশা পেশা হিসেবে অধ্যাপনাকে বেছে নিয়েছিলেন। কর্মজীবনের শুরুতে স্কুলে শিক্ষকতা করেন, পরে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে লেকচারার পদে অধিষ্ঠিত হন। সুতরাং তিনি শিক্ষকতা ভালবাসেন এবং জীবনের প্রায় বিশ বছর শিক্ষক হিসেবেই কাটিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মেজাজ এবং আসক্তির সাথে একাজ বেশ খাপ খেয়ে গেছিল। জীবিকার জন্য অন্যকিছুর সন্ধান করেননি তিনি। কিন্তু আনোয়ার পাশার নেশা ছিল সাহিত্য-সেবা। তিনি মনে-প্রাণে সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। উচচ শিল্পসৃষ্টির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন তাঁর অসম্পূর্ণ জীবনকালে দৃষ্টিগোচর হয় না সত্য, কিন্তু যা রেখে গেছেন তাতে কোথাও কৃত্রিমতা নেই—এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় এবং স্বজ্ঞানসৃষ্ট অকৃত্রিম শিল্পপ্রয়াস পূর্ণাঙ্গতার প্রাক্কালে স্তব্ধ হয়ে গেল বলে বাংলার সাহিত্য জগতে বড় রকমের ক্ষতি থেকে গেল। আনোয়ার পাশা কবি, আনোয়ার পাশা ঔপন্যাসিক, আনোয়ার পাশা ছোটগল্পকার, আনোয়ার পাশা গবেষক এবং প্রাবন্ধিক। মনের চাঞ্চল্য এবং অস্থিরতাহেতু কোন এক মুহূর্তে হয়ত পেশার আকর্ষণ কমে যেত, কিন্তু তাঁর নেশার আসক্তি কখনও কমেনি। পাবনা থেকে লেখা ডায়ারীর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন 'আমি কী করব? কিছুতেই মনে রুচি নেই। সবচেয়ে অরুচিকর লাগছে ক্লাসে পড়াতে। সামান্য কিছু ভাল থাকি যখন লেখার মধ্যে ডুবতে পারি। লেখা নিয়ে থাকলে সব ভুলে থাকতে পারি।' আনোয়ার পাশার লেখার নেশা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল। বলা যায়, লিখতে লিখতে তিনি মারা গেছেন। লেখার কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই আনোয়ার পাশাকে জগৎ থেকে বিদায় নিতে হল, বড় নির্মমভাবে বিদায় নিতে হল তাঁকে। দীর্ঘ নয় মাসের নরক-যন্ত্রণা ভোগ করার পর যখন মুক্তির দিন আসন্নপ্রায় তখন বাংলার আরো অনেক সোনার সন্তানদের সাথে অধ্যাপক-শিল্পী

আনোয়ার পাশাও ইহ জগত থেকে বিদায় নিলেন। উনিশ শ একাত্তরের চৌদ্দই ডিসেম্বর সেই মহাপ্রলয়ের দিন। ঐ একই দিনে অধ্যক্ষ মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীও পশুশক্তির শিকার হন। সেদিন থেকে আজ প্রায় তিন মাস গেল। আজও শোক-স্মৃতি-বেদনায় আমরা মুহ্যমান হয়ে আছি; এর মধ্যে এঁদের জীবনকথা লিখতে হবে তা ভাবতেও পারি না। তবু কিছু লিখতে হবে, কিছু বলতে হবে—এ আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।

সহকর্মী হিসেবে আনোয়ার পাশার খুব কাছাকাছি ছিলাম। ১৯৬৬ সালের ১লা নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যক্ষ মুহম্মদ আব্দুল হাই সাহেবের কক্ষে আনোয়ার পাশাকে প্রথম দেখি। সেদিনই তিনি বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। তখন থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আনোয়ার পাশা কাছের মানুষ ছিলেন। আনোয়ার পাশা আজও দূরে চলে যাননি। তাঁকে খালি চোখে দেখি না, কিন্তু স্মৃতির চোখ দিয়ে তাঁর সব চেহারাটাকেই যেন প্রত্যক্ষ করি। খাঁটি বাঙালীর মত ঈষৎ খাটো শ্যামবর্ণের মানুষ—গোঁফশ্মশ্রুহীন মুখ, চশমা-আঁটা উজ্জল চোখ, অপক্ক কেশ, হাত দুটো একটু বেশী নেড়ে, কোমরে সামান্য ভাঁজ দিয়ে হাটেন, শান্তশিষ্ট, সদালাপী, মিষ্টভাষী, রসিকপ্রিয় মানুষ। মন এবং দেহে মিলে তাঁর ৪৩ বছরের চেহারায় প্রবীণতার তেমন ছাপ পড়েনি, মধ্যত্রিশের মানুষ হিসেবে অনায়াসে ধরা যায় তাঁকে; এজন্য পরিহাসচ্ছলে আমরা তাঁকে 'বয়সচোরা' বলতাম। তাঁর আবাসগৃহে, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ কক্ষে, বিভাগীয় প্রধানের কক্ষে, ক্লাসরুমে, দোতলার বারান্দায় সর্বত্রই এমন মানুষ আনোয়ার পাশাকে পূর্বে যেমনইটি দেখেছি, আজও চোখ বুজলে ঠিক তেমনটি দেখতে পাই। আনোয়ার পাশা যেন আরো কাছে এসে গেছেন। প্রত্যহের দেখা কাছের মানুষকে বাস্তবের আরও পাঁচ জনের মত সহজভাবে গ্রহণ করা যায়, অমূল্যের মত সাজিয়ে রাখা যায় না। এজন্য আনোয়ার পাশার জীবনকথা লেখা আমাদের পক্ষে দুরূহ কাজ। আমরা তাঁকে খণ্ডাংশভাবে দেখিনি অথচ লেখার মধ্যে তাঁর সবটুকু ধরা যায় না, ব্যক্ত করা যায় না। আজ বুঝতে পারি, আমাদের কাছে তৎকালের এবং অনাগতের অনেক কিছুর জন্য আনোয়ার পাশার জীবনের বিশেষ একটা মূল্য ছিল। সেদিন তা পুরোপুরি উপলব্ধি করিনি, কিংবা সময়োপযোগী মনে করিনি। বড় ভুল হয়ে গেছে।

আনোয়ার পাশার ডায়ারী লেখার অভ্যাস ছিল। তাঁর বাসাতে যখন যেতাম তখন মাঝে মাঝে ডায়ারীর পাতা খুলে প্রাসঙ্গিক অংশ বক্তব্যের সমর্থনে পড়ে শোনাতেন। এর একখানি তাঁর সহধর্মিণী মসিনা আনোয়ারের কাছে গচ্ছিত আছে। এতে আনোয়ার পাশার ব্যক্তিগত জীবনের এবং শিল্পী মানসিকতার কিছু

টুকরো কথা আছে। এটি একখানা খাতা, তার প্রায় ৮৬ পাতার পুরোটাই লেখায় ভর্তি—জন্মভূমি ডাকোই-এ লেখা ১৯৫৯ থেকে কর্মভূমে নীলক্ষেতে লেখা ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তীকালের রোজনামচা। খাতার পরিচয়জ্ঞাপক তিনটি নাম আছে—'নিভৃত-মাধুরী', 'খেয়ালখাতা', 'যা খুশী এবং যখন খুশী'। আমরা 'খেয়ালখাতা' নামটি ব্যবহার করব। খাতা সাইজের আর একখানি ডায়ারীতে আনোয়ার পাশার আত্মজীবনী আছে। তিনি এর শিরোনামে 'স্মৃতিলেখা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ১৯৭০ সালের ২৪শে এপ্রিলে লেখা মাত্র সাড়ে নয় পৃষ্ঠা এতে আছে। নিজের এবং পরিজনদের দু'চার কথা বলার পর কলম থেমে গেছে। স্মৃতিমন্থন করে একদিনেই যতটুকু লিখেছিলেন ততটুকু। একেবারে অসম্পূর্ণ তা। আনোয়ার পাশার লেখা পকেট সাইজের আর একখানা ডায়ারী আছে। এতে টুকিটাকি খবর আছে—এর বেশীর ভাগ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের নাম-ঠিকানা, কিছু বইপত্র ও প্রকাশকের নাম-ঠিকানা, সংসারের কিছু হিসেবপত্র। মাঝের এক অংশে Important Dates বলে ব্যক্তিগত জীবনের কিছু তারিখের উল্লেখ আছে। একে আমরা 'পকেট-ডায়ারী' নামে অভিহিত করব। এছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত ফাইলে চিঠিপত্র আছে তাঁর লেখা কয়েকখানি বই এবং প্রবন্ধ মুদ্রিত আকারে এবং পাণ্ডুলিপি আকারে আছে। আনোয়ার পাশার স্ত্রী এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে কিছু কিছু তথ্য জানা গেছে। এসবের ভিত্তিতে অধ্যাপক এবং শিল্পী আনোয়ার পাশার 'জীবনী' লেখায় প্রয়াসী হয়েছি। বলাবাহুল্য, এ তথ্য সামান্য এবং অসম্পূর্ণ। বর্তমানের মানসিক অপ্রস্তুতি, সময়-সংক্ষেপ এবং তথ্যাভাবের জন্য, আশা করি, পাঠকের কাছ থেকে মার্জনা পাব।

দুই

আনোয়ার পাশা তাঁর খেয়ালখাতায় শেষের দিকে ১৩৭৫ সাল, ১৬ই আষাঢ় তারিখে নীলক্ষেত বাসা থেকে লিখেছেন, ''নীড়-সন্ধানী' বই আকারে ছাপা শুরু হল।---এই বইটির প্রায় সব ঘটনাই বাস্তব—তবে সবকটিই আমার জীবনে ঘটেনি।---হাসানের জীবনের কয়েকটি ঘটনা আমার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা।---আমার জীবনের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা সিরাজের মধ্যে দেখানো হয়েছে।" নীড়-সন্ধানী আনোয়ার পাশার প্রথম উপন্যাস। হাসান উপন্যাসের নায়ক, দীপা নায়িকা, সিরাজ পার্শ্বচরিত্র। উপন্যাসে হাসানের ব্যক্তিগত জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা মোটামুটি এরূপ: মুর্শিদাবাদ জেলার কোন এক গ্রামে হাসানের বাড়ী। তার পিতা বিত্তবান জোতদার,

তিনি হাজি, পাড়ায় সম্মানিত ব্যক্তি। দেশের মাদ্রাসা থেকে পাশ করে সে বহরমপুর কলেজে আই. এ. পড়ে। তারপর ১৯৫১ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে। ঐ বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস নিয়ে এম. এ. পড়া শুরু করে। বৈঠকখানা রোডের কারমাইকেল হোষ্টেলে হাসান থাকত। এখানে বন্ধু সিরাজের সাথে পরিচয়, সে বাংলায় এম. এ. পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সহপাঠিনী দীপা দাসের সাথে হাসানের পরিচয় এবং প্রণয়াকর্ষণ গড়ে উঠে। উভয়ের প্রণয়-প্রকৃতিতে অন্তরিকতার অভাব ছিল না। কিন্তু এ প্রণয় পরিণয়ের মাধ্যমে সফলতা পায়নি সামাজিক বিরোধ এবং বৈষম্যের জন্য। ১৯৫৩ সালে হাসান দ্বিতীয় ক্লাস নিয়ে এম. এ. পাশ করে। চাকরীজীবনে হাসানের বড় বিড়ম্বনা উপস্থিত হয়। স্কুল-কলেজে শিক্ষকতার চাকুরী পাওয়া তো দূরের কথা, দরখাস্ত করে ইন্টারভিউ পর্যন্ত পায়না। হাসানের ধারণা মুসলমান বলেই সে চাকরী পাচ্ছে না। সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের জন্য পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানেরা বঞ্চিত এবং লাঞ্ছিত হচ্ছে—এমন অভিজ্ঞতা হাসানের ব্যক্তিগত জীবনেই ঘটেছে। তার অনুপস্থিতিতে তার ঘরে হাতবোমা এবং পাকিস্তানের পতাকা রেখে পরে দারোগা দিয়ে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে গুপ্তচর হিসেবে। বিয়ে করে হাসান যখন সুখের নীড় বাঁধবে ভাবছে তখন আকস্মিকভাবে এবং অন্যায়ভাবে তাকে হাজতে যেতে হল। হাজতের মধ্যেই নীড়ের সন্ধান পেল সে।

ছাত্রজীবনে এবং ছাত্রোত্তর জীবনে হাসান ব্যক্তিগতভাবে পলিটিকস্ করেনি কিন্তু তার নিজস্ব একটা পলিটিক্যাল ভিউ ছিল। মোটামুটিভাবে সে মধ্যম-পন্থী হলেও প্রগতিশীল রাজনীতি ভালবাসতো। বহরমপুরের ভোলানাথ বাবু প্রগতিশীল রাজনীতি করতেন, হাসান তাঁকে পছন্দ করত। কলকাতার বন্ধু হীরেন পুরোপুরি বামপন্থী ছিল। হাসান তার মত জোর গলায় সমর্থন করেছে। ১৯৫৪ সালের গণনির্বাচনে সে কমুনিষ্ট প্রার্থী রমেশ দত্তের পক্ষে নির্বাচনী প্রচার চালায় এবং ভোট দেয়। ভারত ত্যাগ করে পাকিস্তানে যাওয়ার মত হাসান সমর্থন করে না। দেশত্যাগ সমস্যা বাড়ায়, সমস্যার সমাধান করে না। দেশের মাটিতে থেকেই অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সমর্থন করে সে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এক সংস্কারমুক্ত মিলন কামনা করেছে হাসান। হাফিজ-ললিতা দম্পতি, হীরেন মাসুদা দম্পতির মধ্যে তারই চিহ্ন এবং সূচনা দেখেছে সে।

হাসানের জীবন এবং দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি আনোয়ার পাশার জীবনী মিলিয়ে দেখতে হবে। মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

আনোয়ার পাশার 'পকেট-ডায়ারী'তে Important Dates এর তালিকায় কয়েকটি প্রয়োজনীয় তারিখ আছে তার কিছু এখানে যথাযথভাবে তুলে দিলাম।

2nd Baishak, 1335 B.S.—My Birthday.
1st April, 1953—Masina 'comes in my life.
8th December, 1953—Manikchak High Madrasa.
15th March, 1954—Bhabta High Madrasa.
24th January, 1955—Convocation last day with Dipti. and last farewell to Dipti.
1st February, 1957—Sadikhan's Deark Multi-purpose-Higher Secondary School Joining Date.
2nd March, 1958—Pabna Edward College Joining Date.
18th February, 1965—Left India for ever.
12th April, 1965—Citizenship Certificate

এর সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের তারিখ এবং পূর্বের বিভিন্ন পরীক্ষা পাশের তারিখ যোগ করলে যে কাঠামো দাঁড়ায় তাই মোটামুটিভাবে আনোয়ার পাশার ব্যক্তিগত জীবনকথার কাঠামো। তাঁর জীবনের গতি, ক্রিয়া চাঞ্চল্য, স্বপ্ন এবং ভাবাবেগ এই কাঠামোকেই আশ্রয় করে আছে।

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার সদর মহকুমা বহরমপুরের অন্তর্গত রাঙ্গামাটি চাঁদপাড়া ইউনিয়নের ডাবকাই গ্রামে ১৩৩৫ সাল ২রা বৈশাখ মোতাবেক ১৯২৮ সাল, ১৫ই এপ্রিল আনোয়ার পাশা জন্মগ্রহণ করেন।* ডাবকাই ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী গ্রাম। বহরমপুর ভাগীরথীর পূর্ব তীরে—ডাবকাই থেকে মাত্র ৬ মাইল দূরে। এককালের রাজধানী শহর মুর্শিদাবাদ বহরমপুর থেকে ৫ মাইল দূরে। মুর্শিদাবাদ—বহরমপুরের অতি সন্নিকটবর্তী গ্রাম হয়েও ডাবকাই-এ গ্রামের আবহাওয়া পুরামাত্রায় বজায় ছিল। আনোয়ার পাশা 'স্মৃতিলেখা'র পাতায় লিখে-ছেন, "আমরা বাল্যকালে যে গ্রামীণ আবহাওয়াতে মানুষ হয়েছিলাম তাতে পাশ্চাত্য সভ্যতার কোন স্পর্শ ছিল না। আমাদের ইউনিয়ন বোর্ডে আমার আগে বি. এ. পাশ করেছিলেন মাত্র একজন—আমাদের মোহনদা---আমাদের ইউনিয়নের প্রথম এম. এ. পাশ করেছিলাম আমিই।" গ্রামের আবহাওয়ায় লালিত আনোয়ার

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত নথিপত্রে অধ্যাপকদের জন্য লিখিত তাঁর আবেদন পত্রে জন্ম তারিখ আছে ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯২২ সাল; জন্মস্থান, কাজিশাহা গ্রাম। তাঁর পাসপোর্টে একই স্থান ও তারিখ আছে। 'পকেট-ডায়ারী'তে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য, তারিখটা সার্টিফিকেটে কমিয়ে লেখা; স্থানটি নানার বাড়ী।

পাশার মনে এবং জীবনে গ্রামীণ ঐতিহ্য পুরোপুরি মুছে যায়নি। পরবর্তীকালে উচ্চশিক্ষা পেয়েছিলেন রাজধানী কলিকাতা শহরে, কর্মজীবনে আর এক রাজধানী ঢাকা শহরে ছিলেন। কিন্তু গ্রাম জীবনের প্রভাব এবং আকর্ষণ তিনি বিস্মৃত হননি। বিশেষ করে তাঁর জন্মভূমি যেখানে তাঁর শৈশবের বহু মধুময় স্মৃতি জড়িয়ে আছে, হাসিকান্নার বহু ঘটনা ছড়িয়ে আছে সেই মাতৃভূমির কথা বিস্মৃত হননি। পরবর্তী কালে দূরে এসে তার প্রতি আকর্ষণ গেছে আরও বেড়ে। তিনি 'স্মৃতি লেখা'য় বলেছেন, "আমাদের গ্রাম ডাবকাইয়ের আশেপাশের গ্রামগুলির কথা মনে হলে আমি যেন প্রিয়ার স্মৃতি-সৌরভে আকীর্ণ হওয়ার দশাপ্রাপ্ত হই। চিরোটি, চাঁদপাড়া, যদুপুর, মঝিড়া, মধুপুর, আরোঞ্চা, কোদলা—এরা যেন আমার এক-একটি প্রিয়ার নাম। এবং তারা একালের নয়, বিদিশার যুগের নারী সব।--একদিন তাদের সঙ্গে আমার প্রণয় সত্য ছিল—আজও তাদের সৌরভ পাই" এ শুধু আনোয়ার পাশার বাসভূমির প্রতি প্রীতি নয়, এ তাঁর বাংলা পল্লীপ্রীতি, আবহমানকালের বাংলাপ্রীতি। বাংলাদেশ, বাংলাপ্রকৃতি, বাংলা ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য, বাঙালী জাতির প্রতি প্রীতির খবর আমরা ক্রমশ জানতে পারব। আধা গ্রাম, আধা শহর পাবনাকেও তিনি ভালবেসেছিলেন।

আনোয়ার পাশার পিতা মরহুম হাজি মকরম আলী সাহেব, একজন পদস্থ গৃহস্থ ছিলেন। কৃষিনির্ভর জীবন তাঁর, গ্রামের মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি তিনি। নিজে লেখাপড়া বেশি জানতেন না; কিন্তু পুত্রের উচ্চ-শিক্ষার ব্যপারে কসুর করেননি তিনি। আধুনিক শিক্ষার মূল্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি নিজে লেখাপড়া ভাল না জানলেও প্রখর বুদ্ধি এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি রাখতেন। তিনি ইংরেজ আমলে নিজ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। 'খেয়াল-খাতা'র ইংরেজী ১৯.৮.৬৬ তারিখে পিতার পরিচয় প্রসঙ্গে আনোয়ার পাশা লিখেছেন, "আব্বা দেশবিভাগের পূর্বে বহুকাল ইউনিয়নে বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, ফজলুল হক প্রবর্তিত ঋণশালিশী বোর্ডের চেয়ারম্যানও হয়েছিলেন। নির্বাচনে তিনি কখনও পরাজিত হননি।---তিনি মুসলিম লীগের সমর্থক ছিলেন এবং মুসলিম লীগের রাজনীতি করতেন।---আব্বার প্রধান অস্ত্র ছিল প্রখর ন্যায়বোধ এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি। এই দুটির দ্বারাই উচ্চশিক্ষিত হিন্দুদের সাথেও রাজনীতির প্রতিযোগিতা করে গেছেন।" আনোয়ার পাশার মতে তিনি নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিলেন। আলেম-মৌলবীদের কদর এবং অতিথিদের আপ্যায়ন করতেন। পিতার অনেক গুণ আনোয়ার পাশা পেয়েছিলেন, কিন্তু উচ্চশিক্ষার গুণেই হোক অথবা যুক্তিবাদী মনোবৃত্তির জন্য হোক তিনি পিতার গতানুগতিক রাজনৈতিক মতবাদ এবং প্রথাগত ধর্মানুরক্তি দ্বারা প্রভাবিত বা পরিচালিত হননি, পিতাপুত্রানু-

ক্রমে যা অনেকের জীবনেই ঘটে থাকে। 'খেয়ালখাতা'র ৯.৭.৬৬ তারিখের রোজ-নামচায় তিনি লিখেছেন, "আমার বংশের কয়েক পুরুষের নাম জানি—আমার দাদু ভিকুউদ্দিন শেখ, তাঁর দাদু দরবারি খাঁ।---তাঁর আব্বা গুলাব খাঁ নাকি বর্ধমানের কোন স্থানীয় নবাব-দরবারে প্রতিপ্রতিশালী ব্যক্তি ছিলেন।" আনোয়ার পাশার পরিবারের হাল আসলে হয়ত আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না কিন্তু রক্তধারায় খানদানি প্রবাহ ছিল।

আনোয়ার পাশার নামের সাথে 'পাশা' শব্দ কেমন করে এল—এ নিয়ে আমরা তাঁকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতাম, বলতে গেলে বিব্রত করতাম। ডঃ আহমদ শরীফ তাঁকে 'খাসা পাশা' বলতেন। তিনি এর জবাব দেননি কোন-দিন, মনে হত, তিনি যেন মনের দিক থেকে একটু অপ্রস্তুত হয়ে যেতেন। পাশা নামের রহস্য সম্পর্কে সেদিন তিনি কিছু বলেননি, কিন্তু স্মৃতিলেখাতে তার অনেক কথাই বলে গেছেন। তাঁর বক্তব্য দীর্ঘ, দীর্ঘ হলেও আমরা তাঁর উক্তির উদ্ধৃতি পুরোটা দিতে চাই, এতে অন্য সংবাদও পাওয়া যায়ঃ

"সৎ-মায়ের দিক থেকে আমার এক খালু ছিলেন ইংরেজি-জানা লোক। আমার এই কিম্ভুত নামটা অর্থাৎ নামের 'পাশা' অংশটুকু, শুনেছি, আমার সেই খালুজির ইচ্ছায় আমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। খালুজির সেই ইচ্ছাটাকে বহন করতে করতে আমি আজ ক্লান্ত। আমি একাধিকবার চেষ্টা করেছি, আমার নাম থেকে 'পাশা' বর্জন করতে। প্রথমে হাই মাদ্রাসা ফাইনাল পরীক্ষার ফরম, পূরণ-করার সময় 'পাশা' বাদ দিতে চেয়েছিলাম। শিক্ষকরা তাতে বাধা দিয়ে-ছিলেন। অগত্যা পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেটগুলি 'পাশা' লিপ্ত হয়ে আছে। চেষ্টা করেছি, সাহিত্য-ক্ষেত্রে 'পাশা'-বিহীন থাকব। আমার নামের 'আনোয়ার' শব্দটি আমার খুব প্রিয়। সেজন্য ছাত্র অবস্থায় শুধু আনোয়ার নামে লেখা পাঠাতাম। 'বাঙলা ও বাঙালী' নামে একটি পত্রিকায় একটি গল্প প্রকাশিত হয়ে-ছিল তাতে লেখক ছিলেন শুধু আনোয়ার, 'পাশা' বাদ। বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা'য় কবিতা পাঠালে তা মনোনীত হয়; কিন্তু শুধু আনোয়ার নামে তিনি আপত্তি করেন। আমার ঠিকানার স্থানে 'আনোয়ার পাশা' ছিল, সেইখান থেকে 'পাশা' সংগ্রহ করে তিনি ঐ নামে কবিতাটি প্রকাশ করেন।---পাশার হাত থেকে রেহাই পাবার শেষ চেষ্টা করেছিলাম ভারত ছেড়ে আসার পর। ভারত ছেড়ে পাকিস্তানের পাবনা কলেজে চাকরি নিয়ে মনে মনে বলেছিলাম, 'পাশা'! তোমার সঙ্গে এই শেষ, ভারত ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও ছাড়লাম। এবং সত্যি সত্যি যা কিছু লিখতে শুরু করলাম, সব পাশা-বর্জিত হয়ে। তবে এবার আর শুধু 'আনোয়ার' নয়—মুহম্মদ আনোয়ার। মুহম্মদ আনোয়ার নামে একাধিক লেখা

পাবনা কলেজের ম্যাগাজিনে এবং রাজশাহী থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পূর্বমেঘ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বোধ হয় দৈনিক সংবাদ পত্রিকাতে দু'একটা লেখাও মুহম্মদ আনোয়ার লিখে থাকবে—আজ সব কথা মনে নেই। বুদ্ধদেব বসুর একটা যুক্তি মনে লেগেছিল যে এক শব্দে নাম হয় না, অতএব এবার নাম নিয়েছিলাম 'মুহম্মদ আনোয়ার'। কিন্তু এ নামও শেষ পর্যন্ত টেকেনি। দেখা গেল, আমার বিদগ্ধ বামপন্থী বন্ধুরা কেউ মুহমদ আনোয়ার পছন্দ করছেন না। তাঁদের মতে 'আনোয়ার পাশা' অনেক ভাল। ইতিমধ্যে ১৯৬৩ সাল এসে গেছে, আমার দু'দুখানি বইয়ের ছাপার কাজ শুরু হয়েছে। এখন বই বেরুবে কি নামে? আমার প্রথম বই বের হয় কলকাতা থেকে,—'নদী নিঃশেষিত হলে'। বন্ধুবর শঙ্খঘোষের সঙ্গে এই বইয়ের কবিতা-নির্বাচন প্রসঙ্গে অলোচনা হচ্ছিল, সেখানেও প্রশ্ন করে জানতে পারি, আনোয়ার পাশা নামটিই তাঁরা বেশি পছন্দ করেন; 'মুহম্মদ আনোয়ার' নয়। আমার প্রকাশকও 'আনোয়ার পাশা' নামটির ব্যব-সায়গত সুবিধা লক্ষ্য করলেন।---প্রকাশিত হল আনোয়ার পাশার 'নদী নিঃশেষিত হলে'। ঢাকাতে ঐ সময় 'রবীন্দ্রছোটগল্প সমীক্ষা'র ছাপার কাজ চল-ছিল। কয়েক মাস পর বইটি প্রকাশিত হলে তারও লেখক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলেন 'আনোয়ার পাশা', অগত্যা 'মুহম্মদ আনোয়ার' চিরতরে জনতার ভিড়ে হারিয়ে গেলেন।---আনোয়ারের সঙ্গে, পাশার যোগটা স্থায়ী হয়ে গেল।"

আনোয়ার পাশার উপন্যাসে ছোটখাট রসিকতা করার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তিনি নিজেকে নিয়েও যে রসিকতা করতে পারেন এখানে তার দৃষ্টান্ত আছে। একটা ঈষৎ, ক্ষীণ, মৃদু রসিকতা। বলা বাহুল্য, তুরস্কের কামাল পাশার নাম বিশ্বযুদ্ধোত্তেরকালে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতের মুসলমান সমাজে দামাল পুরুষ কামাল পাশার ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রমাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছিল। তখন নজরুল ইসলামের 'আনোয়ার আনোয়ার দুনিয়াটা খুনিয়ার' অথবা 'কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই' লেখা হয়ে গেছে। অতএব ইংরেজী-জানা খালুজির কাছে 'পাশা' শব্দ পরিচিত ও সুপ্রিয় ছিল।

আনোয়ার পাশার বাল্যশিক্ষা হয় মাদ্রাসায়। ভাবতা আজিজিয়া উচচ মাদ্রাসায় তিনি পড়তেন। সেকালের মুসলমান পরিবারের ছেলেরা সাধারণত মাদ্রাসা লাইনে পড়াশুনা করত। কিছুটা খন্ডবোধ, কিছুটা ধর্মীয় সংস্কার এর পেছনে কাজ করত। আধুনিক বিদ্যালয়ে ইংরেজী-বিজ্ঞান ইত্যাদি পড়ান হয়; এতে নাকি ইসলামের জাত থাকে না। লোকে বেদীন হয়ে পড়ে। এমন কথা প্রবীণ গুরুজনদের কাছে আমরাও শুনেছি। প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাই মাদ্রাসায় বাল্যশিক্ষা পেয়েছিলেন। প্রফেসর মুনীর চৌধুরী ঢাকা-কলিকাতা ডিঙিয়ে আলীগড়

মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য গিয়েছিলেন। অবশ্য পরে তিনি সে পথ ত্যাগ করেন।

তা যাই হোক, আনোয়ার পাশা এই মাদ্রাসা থেকেই ১৯৪৬ সালে প্রথম বিভাগে 'হাই মাদ্রাসা' ডিগ্রি নিয়ে পাশ করেন, সেটা ছিল ম্যাট্রিকুলেশন বা প্রবেশিকা পরীক্ষার সমতুল্য। ডাবকাই থেকে ভাবতার দূরত্ব ৫ মাইল—ভাগীরথীর এপার-ওপার। তিনি মাদ্রাসার মেসে থেকে পড়াশুনা করতেন। শৈশব থেকেই বাপমায়ের কোল ছেড়ে প্রবাসী হন তিনি।

ঐ বছর বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে আই. এ. পড়ার জন্য ভর্তি হন। সেখানেও হোস্টেলে থাকেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে আগেই, এখন দেশ স্বাধীন এবং বিভাগ হওয়ার আন্দোলন চলছে পুরোদমে। পরের বছর দেশ ভাগও হয়ে গেল। হিন্দু ও মুসলমান দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশ দ্বিধা দ্বিখণ্ডিত হল। ভারতে ধর্মভিত্তিক আরও অনেক জাতি আছে, প্রদেশগত ভূখণ্ডভিত্তিক জাতিও আছে। শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান হল দেশ ভাগের মানদণ্ড। ভারতের মুসলমানের অনেকে মনে করল পাকিস্তান তাদের দেশ, পাকিস্তানের হিন্দুরা অনেকে মনে করল ভারত তাদের দেশ। কিছু সংগত কারণ, কিছু অহেতুক আবেগের কারণে এরূপ হয়েছে। দেশভাগ হলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ হল না। বাংলার দুপারে দাঙ্গার আগুন জ্বলে—বাঙালী জাতির রক্তে সে আগুন আরও লাল হয়ে উঠে। মুসলমান ভাবে হিন্দু মরেছে, হিন্দু ভাবে মুসলমান মরেছে। এই ভেবে তারা সান্ত্বনা পায়, স্বস্তি পায়। আনোয়ার পাশা রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে আই. এ. পড়েছিলেন। মানুষে মানুষে ভেদ এবং ভেদের জন্য অমানুষিক নির্যাতনের ছবি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। খুব সম্ভব, এ সময়ের অভিজ্ঞতা দিয়ে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'নিষুতি রাতের গাথা' রচিত। উপন্যাসের পটভূমি একটি শহরতলী, সেখানে স্কুল-কলেজ সবই আছে রাজনৈতিক আন্দোলন আছে, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ আছে। ঔপন্যাসিক পরিষ্কারভাবে শহরটির নাম করেননি, কিন্তু পড়তে পড়তে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সেটি বহরমপুর শহর। গল্পের নায়ক সুদীপ্ত শাহিন সমান্য আগে পরে ঐ কলেজে পড়েছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামার শিকার হয়ে আত্মীয়-স্বজন হারিয়ে তাকে শেষ পর্যন্ত ঢাকায় আশ্রয় নিতে হয়েছে। 'নীড়-সন্ধানী' এবং 'নিষুতি রাতের গাথা' পরস্পরের সাপ্লিমেন্টারী। অনেকে মনে করেন, আনোয়ার পাশা এ ধরনের উপন্যাস লিখে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু এ মত সম্পূর্ণ ভুল: তিনি সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের পটভূমিতে উপন্যাস রচনা করে আমাদের সামাজিক বোধের অসারতা চিত্তের অনুদারতা, চিন্তাশক্তির সংকীর্ণতা,

সুবিধাবাদী রাজনীতির বীভৎসতাকে তুলে ধরেছেন এবং ভবিষ্যৎ সমাধানের এবং মিলনের পথ কি সেদিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর পাত্রপাত্রীর নাম শ্যামলেন্দু রহমান, সুদীপ্ত শাহিন, অলকাসুফিয়া প্রভৃতি। বাংলার মাটিতে বাঁচতে হলে এমনিভাবে সংস্কার সাধন, উদার মনোভাবের প্রয়োজন।

আনোয়ার পাশার জীবনের গঠনপর্বে দেশবিভাগের অব্যবহিত পরে আর পাঁচজনের মত সিদ্ধান্ত নিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এলেন বি.এ. পড়তে। তখন ১৯৪৮ সাল। রাজশাহী সরকারী কলেজ তখন নামকরা কলেজ। শোনা যায়, কলিকাতার প্রেসিডেন্সী সরকারী কলেজের পরই স্থান রাজশাহী কলেজের। রাজশাহী মুর্শিদাবাদ পাশাপাশি জেলা—পদ্মার এপার ওপার। হোষ্টেলে থাকেন তিনি; আত্মীয়-স্বজন থেকে তখনও বিচ্ছিন্ন। তিনি শেষ পর্যন্ত এখান থেকেই বি.এ. ডিগ্রি নেন ১৯৫১ সালে। এখানে এক বছর তাঁর ক্ষতি হয়েছিল; ক্ষতির কারণ আমি জানতে পারিনি। বি.এ. পড়ার সময় আনোয়ার পাশার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ কি ছিল জানি না, কিন্তু সাংস্কৃতিক কাজকর্ম যে পুরোমাত্রায় ছিল তার দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। নীড়-সন্ধানী উপন্যাসে হাসান কৃষ্ণনাথ কলেজে আই.এ. পড়ার সময় কবিতা লিখত, তার সহপাঠি বন্ধু মতিনের মন্তব্যে তা জানা যায়। আমরা ডায়রী থেকে জেনেছি হাসানের সাথে আনোয়ার পাশার জীবনের অনেকাংশে মিল আছে। আনোয়ার পাশার সেখানকার সাহিত্য কর্মের নিদর্শন আছে কিনা তা এখনও সংগ্রহ করতে পারিনি। তবে আনোয়ার পাশা কলেজ জীবন কেন, বাল্যজীবন থেকে কবিতা ও গল্প লিখতেন। প্রমাণ এখানে নেই, ডাবকাইএর বাসগৃহ খুঁজলে কিছু উদ্ধার করা যেতে পারে। তাঁর মধ্যম ভ্রাতা আলাউদ্দীন পত্র মারফত আমাকে জানিয়েছেন "তাঁর (আনোয়ার পাশার) কবিতা ও গল্প লেখার ঝোঁক বাল্যকাল হতে। ছোটবেলার অনেক কবিতা বাড়ীতে খুঁজলে হয়ত পাওয়া যেতে পারে। উনি যখন কলেজে পড়তেন তখন কবিতা ও গল্পের বই লিখেছিলেন। সে সব ছাপা হয়নি। আমি একদিন তাকে ছাপার কথা বলেছিলাম। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'এর চেয়ে অনেক ভাল ভাল কবিতার বই আছে, Publisher রা খরচ করে ছাপবে কেন? তাদের ছাপার খরচ উঠবে না। তবুও তিনি যেখানে সেখানে কবিতা লিখে রাখতেন।" সেদিন না হলেও পরবর্তীকালে আনোয়ার পাশার কবিতার বই প্রকাশকেরা খরচ করে ছাপিয়েছিল এবং পাঠকেরা তা পড়েছিল। তাঁর কবিতা লেখার অভ্যাস আবাল্যের এবং তা প্রতিভার অনুকূল, কষ্টপ্রয়াস নয়। রাজশাহী কলেজে বাংলা অনার্স ছিল না; 'বিশেষ বাংলা' ছিল। আনোয়ার পাশা তা পাঠ্য হিসেবে নিয়েছিলেন। বাংলাবিভাগের তখন প্রধান ছিলেন ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক। আনোয়ার পাশা

তাঁর প্রিয়ভাজন ছাত্র ছিলেন। বাংলা বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে ছিলেন জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ আহমদ হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ইদ্রিস আলি, অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী প্রমুখ। আনোয়ার পাশা এদের সান্নিধ্যে থেকে বিভাগের সাথে একাত্ম হয়েছিলেন। তখন 'রাজশাহী কলেজ বার্ষিকী' বেরুত। ১৯৫০ সনে আনোয়ার পাশা উক্ত কলেজ বার্ষিকীর সম্পাদক ছিলেন। কলেজে ছাত্র-পরিষদ সদস্য ভোটে নির্বাচিত হত। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পত্রিকা সমিতির জন্য সম্পাদক মনোনীত করত। আনোয়ার পাশা সেই সম্পাদক মনোনীত হয়েছিলেন, নিজ দক্ষতা এবং যোগ্যতার গুণেই তিনি সে-সম্মান পেয়েছিলেন। সহপাঠী হিসেবে অনেক যোগ্য বন্ধু আনোয়ার পাশা পেয়েছিলেন, তাঁরা এখন অনেকে উচ্চ আসনে সমাসীন আছেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তাঁর সম্পাদিত কলেজ বার্ষিকী সংগ্রহ করতে পারিনি।

দ্বিতীয় বিভাগে বি. এ. পাশ করে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হন ১৯৫১ সালে। আনোয়ার পাশা আবার ভারতে ফিরে গেলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারতেন, কিন্তু হননি। এর জবাব তাঁর উপন্যাসের নায়ক হাসানের জীবনে পাওয়া যায়।

লেখকের ভাষায় "আই.এ. পাশ করে সে পাকিস্তানে বি. এ. পড়তে এসেছিল এখানেই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে বলে। কিন্তু পাকিস্তানে আসার পরেই কেমন-একটা দুশ্চিন্তা তাকে পেয়ে বসল—সে কেবলি ভাবত, এটা কাপুরষতা। অত-গুলি মুসলমান ওখানে পড়ে রইল, আর আমি কেবল নিজের প্রাণটি নিয়ে পালিয়ে বাঁচলাম—এটা অতি নিষ্ঠুর রকমের স্বার্থপরতাও বটে।" দেশত্যাগের এই ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতার বিবেক দংশন অনুভব করতেন বলেই পরবর্তীকালে যখন সংগ্রামবিক্ষুব্ধ এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে দেশত্যাগের প্রশ্ন উঠেছে তখন প্রত্যক্ষভাবে দেখেছি, আনোয়ার পাশা বারবার দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন, নীতির কাছে পীড়া অনুভব করেছেন। গত নয় মাসের অমানুষিক যন্ত্রণা এবং জীবন নাশের মধ্যে থেকে আনোয়ার পাশা অনবরত ভেবেছেন ভারতে চলে যাবেন, সেখানে পিতৃগৃহে অন্ততঃ অন্ন আশ্রয়ের অভাব হবে না তাঁর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যাননি। ইতিমধ্যে দেশে থেকেই যতটুকু সম্ভব প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় তার সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। এবং তিনি তা করেছিলেন। যথা-স্থানে সেকথা বলব। রাজশাহীতে পড়লেও ভারতের নাগরিকত্ব ছাড়েননি। পরে কর্মজীবনে দেশত্যাগ করে এদেশের নাগরিকত্ব নিয়েছিলেন। তিনি একবার দেশত্যাগ করেছিলেন ব্যক্তিস্বার্থের জন্য, দ্বিতীয়বার দেশত্যাগ করেননি দেশের স্বার্থেই। প্রাণ দিয়ে আনোয়ার পাশা সেকথাটাই আমাদের বলে গেলেন। নীতির

সাথে স্বার্থের আপোষের পুনরাবৃত্তি হয়নি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাঙ্গনে দুবছর কাটে তাঁর। তখন বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। অন্য শিক্ষক ছিলেন ডঃ সুকুমার সেন, প্রথমনাথ বিশী প্রমুখ' স্বনামধন্য জ্ঞানীগুণীজন। কারমাইকেল হোষ্টেলে তিনি থাকতেন। এটি মুসলিম হোষ্টেল। ছাত্র জীবনে আমিও এখানে ছিলাম। সে সময় পরিবেশ শান্ত ছিল। আনোয়ার পাশার সময়ে কারমাইকেল হোষ্টেলকে হিন্দু হোষ্টেল করার আন্দোলন উঠেছিল স্বার্থান্বেষী মহল থেকে। আবাসিক ছাত্রদের প্রতিবাদে ও প্রচেষ্টায় তা ব্যর্থ হয়। নীড়সন্ধানীর নায়ক হাসানের ছাত্রজীবনের চিত্রায়নে এর পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন তিনি। হোষ্টেল কস্‌মোপলিটান হোক তাতে হাসানের আপত্তি ছিল না, আপত্তি ছিল মুসলমান ছাত্রদের সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়াতে। যতীনের এক প্রশ্নের জবাবে হাসান বলেছিল, "বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু-মুসলমানের কোন পার্থক্য থাকাটাকে আমরা আমল দিতে চাইনে।---সেই জন্যেই আমাদের প্রস্তাব—শুধু কারমাইকেল নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং ল' কলেজের প্রত্যেকটি হোষ্টেলই জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ছাত্রের জন্য উণ্মুক্ত করা হোক।" হাসানের মত, আনোয়ার পাশার মত। হিন্দু-মুসলমানের মিলন এবং একত্রবাস সুস্থ, সুন্দর এবং স্বচ্ছন্দ বাঙালী সমাজ গড়ে তুলবে একথা আনোয়ার পাশা বিশ্বাস করতেন এবং তার যাত্রার সূচনার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনকে সে-ভূমিকা পালনের ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত করেছেন। কারণ অন্ততঃ সর্বোচ্চ শিক্ষাঙ্গন হিসেবে এখানেই আমরা সকল দ্বন্দ্বদ্বিধা, জড়তা সংস্কারের উর্ধে উঠে বুদ্ধিমুক্তি ও উদারচৈতন্যের পরিচয় দিতে পারব। তিনি কমুনিষ্ট হীরেনের মুখ দিয়ে বলেছেন, "আমরা একটি সমাজই বুঝি, সে আমাদের ছাত্র সমাজ। এখানে আমাদের ধর্মভেদ, জাতিভেদ ওসব কোন কিছুই নেই।" হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সম্পর্ক তিনি নানাভাবে চেয়েছেন, তা তাঁর উপন্যাসে, কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে, ডায়রীতে নানা জায়গায় আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠী হিসেবে কয়েকজনকে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছিলেন —তাঁর পকেট-ডায়রীতে এঁদের অনেকের নাম-ঠিকানা আছে। এঁরা কেউ কেউ পরবর্তীকালে সুনাম ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। কবি শঙ্খ ঘোষ এবং গবেষক ক্ষেত্রগুপ্ত প্রথম সারিতে পড়েন। বিশেষ করে শঙ্খ ঘোষের সাথে আনোয়ার পাশার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তা পূর্বেই একবার দেখেছি। একজন সহ-পাঠিনী দীপ্তি দাসের নাম-ঠিকানা উক্ত ডায়রীর কয়েক জাগায় আছে। প্রথম ঠিকানায় উপরে বাংলায় 'দীপা' কথাটি পরপর দুবার লেখা আছে। দীপা

নীড়-সন্ধানীর নায়িকা। দীপার প্রতি হাসানের এবং হাসানের প্রতি দীপার অকৃত্রিম অন্তরঙ্গতা তথা প্রণয়সম্পর্ক ছিল। ২৬.৩.৭৫ তারিখে খেয়াল-খাতার রোজনামচায় তিনি লিখেছেন, 'দীপা প্রসঙ্গ কিছু কাল্পনিক, কিছু সত্য।' 'নদী নিঃশেষিত হলে' কাব্যের 'ঘরোয়া' কবিতায় সুপ্তির নাম আছে—

'চিঠিতে খবর পাই শ্রীমতী সুপ্তির নাকি বিয়ে,
সেকেলে সংবাদ তাতে নেই কোন রোমান্সের ছোঁয়া
শ্রীমতী সুপ্তির মন তেমন হবে কি ভাবি
গাঢ়-বর্ষার-জলে-ধোঁয়া।'

হাসান পরীক্ষা পাশ করে বাড়ীতে যখন অলস দিন কাটাচ্ছিল তখন দীপার কাছ থেকে ঐ রকম চিঠি পেয়েছিল। আমাদের বিশ্বাস, দীপাদাস এবং শ্রীমতী সুপ্তি তাঁর ক্লাস-বান্ধবী দীপ্তি দাস ছাড়া আর কেউ নয়। পকেট-ডায়রীতে ১৯৫৫ সালের ২৪শে জানুয়ারী সমাবর্তনে গিয়ে দীপ্তি দাসের সাথে শেষ মিলন এবং শেষ বিদায়ের দুটি সংবাদ আছে তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। দীপ্তি দাসের প্রতি আনোয়ার পাশার ব্যক্তিগত ভাললাগার সম্পর্ক ছিল। তাঁর সাথে আলাপ-কালে অনেক খেয়ালী মুহূর্তেই আলোচনায় আমি তাঁর মুখে এ-নাম শুনেছি। প্রিয়জন এধং পরিজনপ্রীতি আনোয়ার পাশার ছিল। তাঁর সৃষ্টির প্রথম ফসল 'নদী নিঃশেষিত হলে' সহধর্মিনী 'মসিনাকে' উৎসর্গ করেছেন। ভারতে পিতা-মাতাকে ছেড়ে এসে তিনি মর্মপীড়া ভোগ করতেন। ভ্রাতৃস্নেহও অপরিসীম ছিল। কলকাতা থেকে তাঁর ভাই আলাউদ্দীন সম্প্রতি এক পত্র মারফত আমাকে জানিয়েছেন, "তিনি (আনোয়ার পাশা) ছিলেন স্নেহপরায়ণ। আমাদের খুব ভালবাসতেন। আমার মনে পড়ে যখন ভাবতা পড়তে যেতেন আমি পিছু নিতাম। আমাকে কোলে করে ভোলাতেন, চোখে জল আসত। বাংলাদেশে চলে পাওয়ার পর মায়ের কথা খুব চিন্তা করতেন। মাকে দেখাশুনার জন্য বারবার বলতেন। মনে পড়ে আমি শেষ যেবার ঢাকা যাই তখন চলে আসার সময় বলেছিলেন 'তোরা সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেলি'। তিনি গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। এখন বার বার সেই কথা মনে পড়ে। তাঁর মন ছিল অত্যন্ত সরল শিশুর ন্যায়। তিনি সঙ্গীপ্রিয় ছিলেন, বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে ভালবাসতেন।" ভ্রাতৃপ্রীতি প্রসঙ্গে আনোয়ার পাশার ডায়রী'র একটি পাতার প্রতি দৃষ্টি পড়ে। আনোয়ার পাশা লিখছেন, "গতকাল রাত্রে আলাউদ্দীন চলে গেল। ······এখন সকালে মনে হচ্ছে আরও দু'একদিন তাকে বলে কয়ে রেখে দিলেই পারতাম। কিন্তু এমনিটিতো যে-কোনদিনই মনে হত। যেদিনই সে যেত সেইদিনই ঠিক এমনটি মন খারাপ

করত। ৩১শে আশ্বিন ১৩৬৮" হৃদয়ের শূন্যতা এবং সান্ত্বনা পাওয়ার কি ব্যর্থ আকুলতা আনোয়ার পাশার। বন্ধুপ্রীতি ছিল তাঁর। বন্ধু রাশিদুল হাসানকে তাঁর ছোটগল্প সংকলন 'নিরুপায় হরিণী' উৎসর্গ করেছেন। ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক রাশিদুল হাসান একই সঙ্গে একইভাবে পশুশক্তির শিকার হয়েছেন। স্বগৃহে আনোয়ার পাশা যখন রাশিদুল হাসানের সাথে আলাপ করছিলেন তখন আলবদর কর্তৃক উভয়েই বন্দী ও বলি হন। 'কারমাইকেল হোষ্টেলের বন্ধুদের'কে তিনি প্রথম উপন্যাস 'নীড়-সন্ধানী' উৎসর্গ করেন। আনোয়ার পাশার স্বজনপ্রীতি ও বন্ধুপ্রীতি অকৃত্রিম ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় তাঁর সাহিত্যকর্ম কিরূপ এগিয়েছিল তার সঠিক নির্ণয় সম্ভব হয়নি, তবে কবিতা লেখার কাজ চলছিল তাতে সন্দেহ নেই। কবিতা দিয়ে আনোয়ার পাশার সাহিত্য জীবন শুরু। শেষের দিকে ছোটগল্প, উপন্যাস লেখার দিকে ঝুঁকেছিলেন, হয়ত বুঝেছিলেন কবিতার পথ তাঁর নয়। তবে কবিতা লেখা একেবারে ছেড়ে দেননি। বর্তমানে 'সমুদ্র শঙ্খলতা উজ্জয়িনী' নামে কবিতার একখানি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত আছে। আনোয়ার পাশার মৃত্যুর পর তাঁর সহপাঠী বন্ধু অশ্রুকুমার শিকদার শিলিগুড়ি থেকে 'দেশ' পত্রিকায় পত্র লেখেন, তা ১৩৭৮ সালের ৮ই মাঘ সংখ্যায় ছাপা হয়। তিনি লিখেছেন, "আনোয়ারের কথা ভাবতে তাঁর একটা কবিতা পেলাম। কবিতাটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ প্রকাশিত 'একতা'র ১৯৫৩ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অন্যতম সম্পাদক ছিলেন কবি শঙ্খঘোষ। ঐ সংখ্যায় সদ্য-ঘটে-যাওয়া পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন বিষয়ে দুটো রচনা ছিল, যে আন্দোলনের মধ্যে বীজ ছিল আজকের বাংলাদেশের।" এরপর 'দীপগুলি' নামে কবিতাটির পুনোদ্ধৃতি দিয়েছেন তিনি। 'নদী নিঃশেষিত হলে' কাব্য গ্রন্থে 'ছড়া' শিরোনামে তা স্থান পেয়েছে। কবিতাটির পটভূমি হয়ত ঐ অগ্নিক্ষরা আন্দোলনই :

এল লাল ধূমকেতু আকাশে
অনেক আগুন দিল ছড়িয়ে।
আমাদের দীপগুলি আত্মাগো
নেবে না কি সে আগুনি ধরিয়ে?

দীপ, আগুন, ধূমকেতু কিসের ইঙ্গিত দেয়? রক্তঝরা বাংলাদেশের অগ্নিদীপ্ত ভাষা আন্দোলন নয় কি? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আনোয়ার পাশার যে নাম-ফাইল আছে তাতে তাঁর সাহিত্যকর্মের রেকর্ডে অন্যান্য গ্রন্থের নামের সাথে এরূপ একটি তালিকা আছে: "পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের নিম্নলিখিত পত্রিকাসমূহে

আমার কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে :—কবিতা : বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত, ক্রান্তি : নীহাররঞ্জ রায় ও ত্রিদিব চৌধুরী সম্পাদিত, দেশ, উত্তরসূরী, কৃত্তিবাস, আধুনিক কবিতা, পূর্বমেঘ, সাহিত্য পত্রিকা, পরিক্রমা, মাহে-নও ইত্যাদি।" আমরা জানি, পূর্বমেঘ, সাহিত্য পত্রিকা, পরিক্রম, মাহে-নও পূর্ববঙ্গের পত্রিকা। আগের পত্রিকাগুলি পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা'র ১৩৬৪, পৌষ সংখ্যায় আনোয়ার পাশার 'পথ চলে যে লোকটা' শীর্ষক একটি কবিতা মুদ্রিত হয়েছিল। কবিতাটি 'নদী নিঃশেষিত হলে' কাব্যে সংকলিত হয়েছে। এটা ছাত্রোত্তর জীবনের কথা। অন্যান্য পত্রপত্রিকায় আনোয়ার পাশার কোন্ শ্রেণীর লেখা কখন প্রকাশিত হয়েছিল তার সন্ধান দিতে বর্তমান প্রবন্ধ লেখক অক্ষম। 'স্মৃতিলেখা'র একটি উদ্ধৃতিতে দেখেছি, 'বাংলা ও বাঙালী' নামের পত্রিকায় তাঁর গল্প ছাপা হয়েছিল। কোন সংখ্যায় কোন গল্প তারও খবর দিতে আমি অপারগ। তিনি নিজে যেমন অবিরাম লিখতেন ও তেমনি লেখা অনবরত পড়তেন। তাঁর ব্যক্তিগত পুস্তক সংগ্রহ অতি সমৃদ্ধ এবং উন্নত-মানের। বলা যায় বই কেনা তাঁর 'হবি' ছিল। এ বিষয়ে সুন্দর আলোকপাত করেছেন, জনাব আলাউদ্দীন। তাঁর ভাষায়, "আমার মতে তাঁর হবি বলতে ছিল বই কিনা। ছোটবেলা হতেই তার বই কেনার ঝোঁক ছিল।---অন্য কোন কথা ভুলে গেলেও বই কিনতে কখনও ভুলতেন না। বহরমপুর বা কোলকাতা গেলে কয়েকখানা বই না কিনে তিনি বাড়ী আসতেন না।" আনোয়ার পাশার সুদৃশ্য মলাটবদ্ধ সুসজ্জিত পুস্তক সংগ্রহ আমিও দেখেছি। তিনি অতি যত্নে এগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। আমি বলতাম, 'এত সংখ্যক এবং এমন মূল্যবান বই কোথায় পেলেন?' তিনি বলতেন 'ছাত্র জীবন থেকেই বই সংগ্রহ করতাম। কলকাতায় অনেকে সিগরেট সিনেমা করে পয়সা খরচ করে। আমি সেই পয়সাতেই বই কিনতাম।' পরবর্তীকালেও আনোয়ার পাশাকে বাজে খরচ করতে দেখিনি। তাঁর রুচিবান, সংস্কৃতিবান মানসচর্যার শুরু প্রথম থেকেই। প্রথম থেকেই তিনি আর পাঁচ জন হতে পৃথক হয়ে উঠেছিলেন। প্রভাত-সূর্য দিনের সংকেত এমনি করেই দেয়।

১৯৫৩ সালে আনোয়ার পাশা দ্বিতীয় বিভাগে এম. এ. পাশ করলেন। তাঁর পরীক্ষার ফল খুব উজ্জ্বল নয়। তিনি বলতেন, "যেভাবেই পড়ি, একটা সেকেণ্ড ক্লাস পাব—এটা জেনে নিয়ে পড়াশুনার ধারে কাছে যাইনি।" আনোয়ার পাশার এ ধারণা সেদিন যে ফলই নিয়ে আসুক, পরবর্তী কর্মজীবনে বেদনার কারণ হয়েছিল। আর যে গুণই থাক, ডিগ্রি না থাকলে আমারা তার মূল্য দিই না।

আনোয়ার পাশার শিক্ষাজীবনের শেষ,—এখন থেকে কর্মজীবন, সংসার জীবনের শুরু। ঐ বছর গোড়ার দিকে তিনি বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করেন। বছরের শেষের দিকে মানিকচক হাই মাদ্রাসায় সুপারিনটেণ্ডেন্ট নিযুক্ত হন। পরের বছর ১৫ই মার্চ ভাবতা হাই মাদ্রাসায় আসেন, এখানে তিনি নিজে লেখা-পড়া করেছিলেন। ১৯৫৭ সালে ১লা ফেব্রুয়ারী সাদিখান দিয়াড় বহুমুখী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। মাদ্রাসা থেকে এলেন স্কুলে। এখানে এক বছর চাকুরী করে বিদায় নিয়ে আসেন পাবনায়। পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে বাংলার অধ্যাপক পদে যোগদান করেন ১৯৫৮ সালের ২রা মার্চ। আনোয়ার পাশা পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এলেন। কেন এলেন? তাঁর নিজের ভাষায় বলি, "বাপ-মা যে আমার উপর খুশী নয় এটা আমার প্রাণে খুবই বাজছে। এদেশের কোন কলেজে চাকরী পেলে তাঁদের খুশী করতে পারতাম। ওখানে চাকরীটা ভাল, পরিবেশ ভাল নয়---আমার ন্যূনতম দাবী যে কোন কলেজের একটি চাকরী এখানে মেটান অসম্ভব। এরা বিশ্বাসই করতে পারছে না যে কোন মুসলমান কলেজে বাংলা পড়াতে সক্ষম। দরখাস্ত করে কোন কলেজ থেকে এ পর্যন্ত Interview Call পাইনি।--- আমার অন্যান্য সহপাঠী বন্ধুরা আমার মত result করে কলেজের চাকরী পেয়েছে---তারা সকলেই হিন্দু।" ১৯৬০ সাল ৯ই জুন ডাবকাই থেকে খেয়াল-খাতায় লেখা এটি। স্পষ্টতঃ জীবিকার সন্ধানে তিনি এখানে আসেন। স্কুলের শিক্ষকতায় তিনি তুষ্ট হতে পারেননি, তাতে জীবিকা থাকলেও মর্যাদা ছিল না। আনোয়ার পাশার অনুজ মহম্মদ আলাউদ্দীনের কাছ থেকে সম্প্রতি প্রাপ্ত ১৫.৩.৭২ তারিখের পত্রে ঠিক একই মত জানা যায়। তিনি লিখেছেন, "আমি ভাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কোন স্কুলে কাজ না করার কারণ কি? তিনি বলেছিলেন স্কুলে শিক্ষকতা করলে যেটুকু জানি সব বৃথা হয়ে যাবে। আমি কলেজে শিক্ষকতা করতে চাই। পড়তে চাই, আরও জানতে চাই এবং পড়াতে চাই। 'এখানে অনেক কলেজে apply করেছিলেন, কিন্তু Chance পাননি।" যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরী পাচ্ছেন না, এটাই তাকে বেশী পীড়া দিয়েছিল, পীড়া দিয়েছিল এই ভেবে যে প্রকৃত জ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্র পাচ্ছেন না। তিনি মাতৃভূমি ছাড়লেন। প্রথমবার যুগের বলি হলেন। এ পর্যন্ত আনোয়ার পাশার জীবনের এক অধ্যায় জীবনের পূর্বাধ্যায়। এক নিশ্চিত আশ্রয় থেকে ছিন্নমূল হওয়ার অধ্যায়।

চার

আনোয়ার পাশা পূর্ব বাংলায় এলেন। তাঁর জীবনের দ্বিতীয়ার্ধের শুরু। বড়ই অসম্পূর্ণ অধ্যায় তা। তিনি কলেজের অধ্যাপক হলেন। তাঁর স্বপ্নসাধ

পূর্ণ হল। তিনি যে পড়তে চান, পড়াতে চান, জানতে আরও চান, জানাতে চান তার সুযোগ এল। আনোয়ার পাশা পূর্ণভাবে নিজেকেই ব্যাপৃত রাখলেন সে কাজে। তিনি অধ্যাপকের পূর্ণ দায়িত্ব পালন করলেন। ভাল অধ্যাপক হলেন। এডওয়ার্ড কলেজে আনোয়ার পাশা লেখাপড়া নিয়েই থাকতেন তাঁর স্বপ্ন সফল করে তোলার জন্য। তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন, তিনি যা চেয়েছিলেন সুযোগ পাওয়া মাত্র তা কাজে পরিণত করেছেন। পাবনায় অবস্থানকাল তাঁর প্রতিভার বিকাশের পর্ব, তাঁর দক্ষতার প্রকাশের পর্ব, তাঁর জ্ঞানের সমৃদ্ধির পর্ব। আনোয়ার পাশা আশা আকাংখার অনেক কিছু পেলেন বটে কিন্তু তিনি কি সুখী হলেন? তাঁর ডায়ারীর পাতা দেখা যাক। ১৯৬০ সাল ২৬শে আগষ্ট খেয়াল-খাতায় তিনি লিখেছেন, "এখানে আমি মুসলমান নই বলে বদনাম রটেছে। ভারতের মাটিতে আমার পরিচয় মুসলমান বলে আর পাকিস্তানে আমি ঘৃণিত এবং অবহেলিত হচ্ছি মুসলমান নই বলে।---যে পরিবেশে এখানে আছি তাতে কেবল মর্যাদা নিয়ে গৌরব করবার কিছু নেই। অধ্যাপকরা এদেশে যেন অভিশপ্ত জীব।---সাংস্কৃতিক মান এখানকার অত্যন্ত নিম্নস্তরের এক কথায় দৈনন্দিন জীবন এখানে আদৌ সুখকর নয়। তার উপরে আছে যথেষ্ট পরিমাণে মুসলমান না-হতে-পারার লাঞ্ছনা।" পাবনা একটা মফঃস্বল শহর, কলিকাতার আবহাওয়ায় লালিত মন এখানে সাংস্কৃতিক মান উঁচু দরের পাবেন না তা খুবই স্বাভাবিক। তিনি 'যথেষ্ট পরিমাণে মুসলমান' নন এর প্রকৃত তাৎপর্য কি তা আমরা নিশ্চিত করে জানি না; তবে অনুমান করতে পারি যে একটা স্পষ্ট বিরোধ দানা বেঁধে উঠেছিল। এ বিরোধ রক্ষণশীলতার আর সংস্কারমুক্তির বিরোধ, এ বিরোধ সাম্প্রদায়িকতার আর উদার মানবিকতার বিরোধ। প্রগতি-বাদী চিন্তাধারার আর উগ্রপন্থীর স্বার্থবুদ্ধির বিরোধ। নতুন পরিবেশে এসে দু বছরের মধ্যেই এরূপ মানসসংকট বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। আনোয়ার পাশার জীবনে এদেশের অবরুদ্ধ সাংস্কৃতিক মান এবং অপরিচ্ছন্ন মনোভাবের জন্য দ্বন্দ্ব বেধে গেল। আর এই দ্বন্দ্বই শেষ পর্যন্ত কাল হয়ে দাঁড়াল। ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ সাল ডায়ারীর পাতায় তিনি লিখেছেন, "ইসলামি সাহিত্য বলে একটা কথা উঠেছে। বাংলা সাহিত্য নাকি বর্তমানে হিন্দুধর্মাবলম্বী, তাকে মুসলমান করতে হবে। কথাটা একবার ঢাকাতে কবি শামসুর রাহমান সাহেবের সামনে তুলে-ছিলাম। 'ইসলামী শব্দ ইসলামী ভাবধারা প্রভৃতি আমাদানীর সজ্ঞান-প্রচেষ্টার দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে যে শুদ্ধিকরণের চেষ্টা চলেছে সে সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন?' 'এ রকম চেষ্টা যারা চালাচ্ছে তারা Confirmed fool–তিনি উত্তর দিয়েছিলেন।' বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে এমনি শুদ্ধিকরণের চেষ্টা বাংলা

গদ্যসাহিত্য সৃষ্টির প্রথম যুগে হিন্দুরা করেছিল। তারা তৎকালীন প্রচলিত আরবী-ফারসী শব্দকে একেবারে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। আমার মনে হয় তারাও ছিল Confirmed fool। আমার মতে ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোন জবরদস্তি চলে না। হিন্দু পণ্ডিতেরা যেমন সহস্র প্রচেষ্টাতেও আমাদের ভাষার উপর থেকে আরবী ফারসীর প্রভাব সমূলে বিনাশ করতে, পারেননি তেমনি মুসলমান প্রতিক্রিয়াশীলদেরও মুসলমানীকরণ প্রচেষ্টা এই ভাষার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হতে বাধ্য।" পাবনার মত একটা সাধারণ শহরের বুকে বসে একি মনোভাব আনোয়ার পাশার—এ যে এক ঝড়ের সংকেত, এক অশুভ ঝড়ের সংকেত। আমরা এখন বুঝতে পারি, তিনি কেন 'যথেষ্ট পরিমাণে মুসলমান' নন।

আনোয়ার পাশার মতে, পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর প্রথম মুদ্রিত লেখা ত্রৈমাসিক পূর্বমেঘে প্রকাশিত 'ইসলামে চিন্তার মুক্তি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ। তিনি পুরোপুরি বুদ্ধিমুক্তির সমর্থক ছিলেন। এর জন্য ধর্মের বাঁধন যদি শিথিল হয় তাতেও আপত্তি নেই। 'নীড়সন্ধানী'তে হাসানের মুখ দিয়ে বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলনকে সমর্থন এবং অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। বিশেষতঃ মুসলমান সমাজের রক্ষণশীলতা এবং ধর্মান্ধতার জন্য বারবার দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "মুসলমানদের উন্নতি যে হচ্ছে না তার একটি বড় কারণ এই যে, এদের মধ্যে কোন জিজ্ঞাসা নেই, জীবন ও জগতের রহস্য এদের কাছে আশ্চর্য রকম স্বচ্ছ ও সরল। এদের কাছে জ্ঞানী বা আলেম হলেন তিনিই যিনি সারা জীবন ধরে কেবলি কোরান-হাদিসের ভাষ্য মুখস্থ করেছেন এবং যিনি বিপুল সৃষ্টি-রহস্যের সম্মুখীন হলে তার সমাধানের জন্য একটি বাক্যই যথেষ্ট মনে করেছেন যে আল্লাহ বলেছেন 'হোক' এবং হয়ে গেছে, বিশ্বসংসারের সব কিছু আল্লাহর হুকুমে চলেছে। অতএব মানুষের করণীয় কিছু নেই।" আল্লাহভরসাসর্বস্ব, জীবন-জিজ্ঞাসাহীন জ্ঞান-চিন্তা আধুনিক প্রগতির পরিপন্থী একথাটাই তিনি বলতে চেয়েছেন। নীড়সন্ধানী পাবনাতে বসে লেখা। 'নিশুতি রাতের গাথা'র নায়ক সুদীপ্ত শাহিনের পিতার চরিত্র প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন, "তাঁর মুসলিম আত্মীয়-স্বজন অনেকেই তাঁকে কাফের হয়ে গেছে ভেবে বয়কট করেছিল, যদিও সত্যকার কাফের তিনি ছিলেন না। তিনি নামাজ নিয়মিত পড়তেন, কিন্তু রোজা করতেন না, জাকাতও দিতেন না। ---জাকাত দিতেন না এইজন্য যে তাঁকে ইনকাম ট্যাক্স দিতে হত। তর্ক উঠলে তিনি বলতেন—"এককালে সুসংহত রাষ্ট্রের অভাবে সমাজের নানাবিধ সমস্যার মোকাবিলা করতে হত ধর্মকে, এখন রাষ্ট্র যখন তার দায়িত্ব পালনে সমর্থ তখন ধর্মকে খনিক রেহাই দেওয়া যেতে পারে। সকলেই

এটাকে শয়তানের যুক্তি বলে এড়িয়ে যেত।" এ উপন্যাস লেখার সূত্রপাতও পাবনাতে। এবার আমাদের আর বুঝতে অসুবিধা হয় না, কেন আনোয়ার পাশা 'যথেষ্ট পরিমাণে মুসলমান নন।' এক সময় নজরুলকেও এ অভিযোগের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। তা যাই হোক আমরা ঝড়ের কথা বলছিলাম,—বাংলা ভাষা শুদ্ধিকরণ অভিযানের কথা। আমরা সবাই জানি, এটা ছিল বাঙালীর ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকার সাধন করে বাঙালীকে চিরকালের জন্য পঙ্গু করে রাখার এক ষড়যন্ত্র, পাকিস্তান নামে কায়েমী স্বার্থবাদী দানবচক্রের ষড়যন্ত্র। খুব দুঃখের কথা, আমাদের অনেকে এ ষড়যন্ত্রের হাতিয়ার হয়েছিলেন, কেবল কয়েকজন বীর সন্তান ছাড়া। তাঁরা এতে হাত মিলাননি অথবা এর সাথে আপোষ করেননি। ফলে ফল যা হবার তাই হয়েছে। সরকারের রক্তচক্ষু রুদ্ররোষ তাঁদের উপর পড়েছে, তাঁরা আজ অনেকে সেই পৈশাচিক ক্রোধের শিকার হয়েছেন। প্রফেসর আবদুল হাই, প্রফেসর মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী এঁদের মধ্যে পড়েন। শুদ্ধিকরণ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির অনুরাগী আনোয়ার পাশার চিত্ততলকেও তা আলোড়িত ও অভিভূত করেছিল। ২১.২.৬৬ তারিখে লেখা রোজনামচা "১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের এই দিনটিতে দেশের তরুণ ছাত্ররা পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছিল। ভাষার জন্য তাদের সেই সংগ্রাম ছিল একটা পুরোনো আদর্শের বিরুদ্ধে একটা নবীন আদর্শের সংগ্রাম। এদেশের উর্দু সমর্থনকারীগণ মধ্য-যুগীয় ভাবাদর্শে বিশ্বাসী ছিল। ---একুশে ফেব্রুয়ারী শুধু ভাষার জন্য সংগ্রামের দিন নয়, একুশে ফেব্রুয়ারী হচ্ছে মধ্যযুগীয় প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের বিরুদ্ধে আধুনিক জীবনাদর্শের জয়। একুশে ফেব্রুয়ারীতে আমাদের শপথ হবে---আমরা প্রতিক্রিয়াশীলদের সর্বপ্রকার চক্রান্তের বিরুদ্ধে চির-অতন্দ্র সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করব, আমরা দেশকে কখন মুষ্টিমেয়ের ভোগের জন্য বিলিয়ে দেব না।"

১৯৬১ সাল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হবে। পশ্চিমবঙ্গে এ নিয়ে মহা আয়োজন। আনোয়ার পাশা রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ ভক্ত। তাঁর প্রথম আলোচনা গ্রন্থ 'রবীন্দ্রছোট গল্প সমীক্ষা' প্রথম খণ্ড : ১৯৬৩ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৯ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয়। উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড পাণ্ডুলিপি আকারে সমাপ্ত হয়ে আছে। এ গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা পাবনাতে এবং রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় আনোয়ার পাশা লিখেছেন, "রবীন্দ্রশতজন্মবার্ষিকীতে মনের মধ্যে যে একটা গভীর সাড়া অনুভব করেছিলাম তারই ফল আমার এই গ্রন্থখানি। রবীন্দ্রসাহিত্যের যে-কোন একটি দিকের সম্পর্কে কিছু লিখব এবং

সেই হবে জন্মশতবর্ষপূর্তিতে কবি গুরুর উদ্দেশ্যে আমার হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য—এমনি একটা আর্তি ছিল সেদিন মনে।---আমার ভক্তি ভালবাসা এবং বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে কবিগুরুকে সমগ্র সত্তায় উপলব্ধি করতে চেয়েছি শুধু।" রবীন্দ্র-নাথের অকৃত্রিম ভক্ত ছিলেন অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। তাঁদের ঘরে আলমারিতে রবীন্দ্রনাথের সব রচনা আছে; রবীন্দ্রনাথের মূর্তি আছে ফ্রেমে বাঁধান। স্মৃতিলেখায় আনোয়ার পাশা লিখেছেন, "বৈশাখে জন্মেছি বলে আমার মনে বেশ একটা গর্ব আছে। ঐ বৈশাখ যে রবীন্দ্রনাথের জন্ম-মাস।" ১৯৬০ সাল ২৬শে জুলাই খেয়ালখাতায় লেখা "রবীন্দ্রনাথকে যখন কেউ ভুল বোঝে অথবা ছোট করে দেখতে চায় তখন সেটা আমার ভয়ানক অসহ্য লাগে। রবীন্দ্র নাথকে বাদ দিলে আমাদের যে কিছুই থাকে না—এটুকু বুঝবার মত বুদ্ধিও আমাদের যদি নেই তবে কি নিয়ে বাঁচব আমরা?"

আনোয়ার পাশা পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের আয়োজন করেন। পাবনা অন্নদাগোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী, মহাকালী বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানেও অনুষ্ঠান হয়। প্রথম প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে আনোয়ার পাশা 'রবীন্দ্রছোটগল্পে প্রকৃতি' শিরোনামে প্রবন্ধ পাঠ করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যক্ষ ডঃ মযহারুল ইসলাম প্রধান অতিথি ছিলেন। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে আনোয়ার পাশা সভাপতিত্ব করেন। মজুমদার একাডেমীর শিক্ষক বিজয়বাবুর নিজ গৃহে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানেও তিনি পৌরোহিত্য করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমাদের মুক্তি নেই।---রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনের প্রায় সবখানি অধিকার করে আছেন, তাঁকে বাদ দিতে গেলে সম্পূর্ণ আমার এই 'আমি'টাই না হয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর আত্মার আত্মীয়।" এতথ্য তাঁর খেয়াল-খাতায় ২৮শে বৈশাখ, ১৩৬৮ তারিখের রোজনামচায় পাওয়া যায়। আনোয়ার পাশা রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে অনুষ্ঠান করলেন, অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন, প্রবন্ধ পড়লেন, পৌরোহিত্য করলেন, ভাষণ দিলেন; তারপর সব থেমে গেল। সব থেমে গেল বটে কিন্তু সব শেষ হয়ে গেল কি? রবীন্দ্রসাহিত্য, রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে জোর একটা প্রতিক্রিয়া এদেশে চলছিল এখানেও সেই কায়েমী স্বার্থের হীনচক্রান্ত। এ নিয়ে ঢাকাতেও দলাদলি, হৈ চৈ বাদ-প্রতিবাদ। আনোয়ার পাশা এ জেনে শুনেও বরং জোরেসোরেই নানা অনুষ্ঠান করলেন। কিন্তু রক্তচক্ষু ছেড়ে দিল না তাঁকে। আই. বি. রিপোর্টে তাঁর পাসপোর্ট ছ' বছরের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। পরে পাবনার ডি. সি. কাজী জালালউদ্দীন এবং ইংরেজীর অধ্যাপক মুজিবর রহমানের চেষ্টায় তিনি পাসপোর্ট পুনরুদ্ধার করেন। আনোয়ার পাশা যথেষ্ট পরিমাণে মুসলমান

না হওয়ার হয়ত এটাও একটা কারণ। আই. বি. র খাতায় আনোয়ার পাশার নাম সুচিহ্নিত হয়ে যায়।

পাবনায় আনোয়ার পাশার আরও অনেক কাজ, অনেক কীর্তি। এডওয়ার্ড কলেজের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক মুজিবর রহমান সম্প্রতি এক পত্রে আমাকে জানিয়েছেন, "পাবনা কলেজে এখন বাংলাতে অনার্স পড়ান হয় এবং এই অনার্স কোর্স চালু করার সর্বকৃতিত্ব আনোয়ার পাশার। যতদিন সে এই কলেজে ছিল, ততদিন অনার্স বিভাগের সেই ছিল প্রধানতম প্রাণকেন্দ্র।"

১৯৬০ সালে পাবনা কলেজে বাংলা অনার্স খোলা হয়। বিভিন্ন সময়ে কলেজের নানা অনুষ্ঠানে আনোয়ার পাশা আছেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিচালনা তিনিই করতেন। অনুষ্ঠানসূচী এবং ধারাবিবরণী তিনি লিখে দিতেন। কলেজবার্ষিকীর উপদেষ্টা হিসেবে তিনি বহু দায়িত্ব পালন করতেন। বলতে গেলে, সমস্ত কলেজে তিনি প্রাণচাঞ্চল্য এনে দিয়েছিলেন। জনাব মুজিবর রহমানের ভাষায়—"আনোয়ার নিজে কবিতা লিখত এবং এডওয়ার্ড কলেজের বার্ষিকীর ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক হিসাবে কাব্যানুরাগী ছাত্রদের কবিতা লেখায় অনুপ্রাণিত করতেও তাকে দেখেছি। তারই উৎসাহে এবং পরিচালনায় পাবনা কলেজের ছাত্রদের একটা সাহিত্যচক্র গড়ে ওঠে ও নিয়মিত এই সাহিত্য চক্রে ছাত্রদের লেখা গল্প-কবিতা ইত্যাদি পঠিত ও আলোচিত হত।" হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের উপরে একটি আলোচনা-সভা পাবনা কলেজে তাঁরই উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। এতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ কাজী আবদুল মান্নান অতিথি হিসেবে আহূত হন।

শুধু কলেজ প্রাঙ্গণ নয়, কলেজের সীমানা ছাড়িয়ে পাবনা শহরের নানা প্রান্তে তাঁর গতিবিধি এবং ক্রিয়াকলাপ অভিনন্দিত ছিল। জনাব মুজিবর রহমান এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করে লিখেছেন, "পাবনাতে প্রথমে সাহিত্য পরিষদ ও পরবর্তীকালে সাহিত্য মজলিস নামে যে সংস্থা গড়ে ওঠে আনোয়ার তার শুধু সভ্যই ছিল না; এদের পরিচালনায় কার্যধারায় তাঁর বিশেষ দান ছিল। সাহিত্য মজলিসে যে সব লেখা পঠিত হত সুধীসমাবেশে, আনোয়ার তার ছিল 'অফিসিয়াল ক্রিটিক'। আনোয়ার পাবনা ছেড়ে যাবার পরে এই সাহিত্য মজলিস অনেকটা প্রাণস্পন্দনহীন হয়ে পড়ে।" পাবনা 'সাহিত্য মজলিস' সম্পর্কে কিছু বক্তব্য আছে। এটি সম্পূর্ণ ঘরোয়া সাহিত্য মজলিস। এতে অংশ নিতেন শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তদানীন্তন ডি. সি. জনাব লুৎফল বারি, এ. ডি. সি. জনাব সিরাজুদ্দিন, এস. পি. জনাব আবদুল খালেক প্রমুখ সরকারী পদস্থ কর্মচারী এতে অংশ গ্রহণ করতেন। কলেজের কতিপয় শিল্পানুরাগী অধ্যাপক ও স্থানীয়কছু উৎসাহী অধিবাসী এতে

যোগদান করতেন। আনোয়ার পাশা এঁদের মধ্যমণি ছিলেন। বলতে গেলে, তাঁরই উদ্যোগে 'সাহিত্য মজলিস' চক্র গড়ে উঠে। তিনিই এ রসসভায় অধিক রসদ যোগান দিতেন।

পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে তিনি প্রথমে বাংলা বিভাগে লেকচারার ও পরে অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। এখানে থাকার সময় তিনি 'ইমিগ্রেশন সার্টিফিকেট' নিয়ে ১৯৬৪ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারী চিরকালের জন্য ভারত ত্যাগ করে চলে আসেন। পরের বছর ১২ই এপ্রিল তিনি পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। এর পরবছর তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। তিনি পক্ষাঘাতে ডাবকাই-এ মারা যান। মৃত্যু-কালে পিতার মুখ পর্যন্ত দেখতে পারেনি বলে আনোয়ার পাশার অন্তরের বেদনা ছিল অপরিসীম। দুঃসময়ে পিতার কাছে থেকে তাঁর সেবাশুশ্রূষা করতে পারেননি সেজন্য তিনি আত্মপীড়া ও অনুশোচনা অনুভব করেছেন। তিনি কিরূপ আত্মধিক্কার এবং মর্মপীড়া অনুভব করেছিলেন তার একটা নমুনা ১৭.৮.৬৬ তারিখের ডায়ারী থেকে তুলে দিই "দুসপ্তাহ আগে ঠিক এই দিনে আব্বা মারা গেছেন।---কি করে আমি বিবেকের এই দংশন থেকে নিজেকে বাঁচাব যে আমি আমার কর্তব্য করিনি। অন্য কোন কর্তব্যে অবহেলা করলে সে কথা হচ্ছে স্বতন্ত্র, কিন্তু বাপমায়ের প্রতি কর্তব্য অবহেলা কেবল অতি অধম সন্তানের পক্ষেই সম্ভব—সে সন্তানের পক্ষে নিজেকে মানুষ বলে দাবী করা শোভা পায় না।" বিবেকবান, কর্তব্যপরায়ণ হয়েও আনোয়ার পাশা পিতামাতার সেবা করতে পারেননি সে কার অপরাধ, তাঁর নিজের, না কালের? যুগ তাঁকে মনের দিক থেকে দেউলিয়া করে দিয়েছে। মৃত পিতার কবরও তিনি দেখতে পাননি, কারণ তখন ভারতে যাওয়ার পথ প্রায় রুদ্ধই ছিল। এজন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করতেন। তাঁর আর ভারতে যাওয়া হয়নি। সেখানে মা এখনও জীবিত আছেন তাঁকেও দেখা হল না আনোয়ার পাশার।

১৯৬৬ সালের ১লা নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জুনিয়র লেকচারার হিসেবে আনোয়ার পাশা যোগদান করেন। ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৬ প্রায় ১৪ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়েও তিনি একটি ভাল পদ পাননি। ১৯৭০ সালে ২২শে জুন তিনি সিনিয়ার লেকচারার হয়েছিলেন। প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হাই তখন বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। ঢাকায় এসে নিষ্ঠাবান জ্ঞানপিপাসুর মত সাধনা করতেন আনোয়ার পাশা। নিজে পড়েন ও ছাত্রদের পড়ান তাঁর ব্রত। একের পর এক বই পুস্তক লিখে চলেছেন তিনি। ১৯৬৭ সালে গবেষণাগ্রন্থ 'সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল,' ১৯৬৮ সালে উপন্যাস 'নীড়-সন্ধানী,' ও 'নিশুতি রাতের গাথা', ১৯৬৯ সালে রবীন্দ্র ছোটগল্পসমীক্ষার প্রায় পুনর্লিখিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭০ সালে ছোট

গল্প সংকলন 'নিরুপায় হরিণী' প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ-গল্প-কবিতা অনবরত লিখতেন। পরবর্তী সময়ে লেখা দুখানি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত আছে, সেগুলির নাম 'রাইফেল- রোটি-আওরত' ও 'নেতিগর্ভ',। 'সমুদ্র শৃঙ্খলতা উজ্জয়িনী' শিরোনামে একখানি কবিতা সংকলনেরও পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত আছে। রবীন্দ্রছোটগল্প সমীক্ষা দ্বিতীয় খণ্ড ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ কর্তৃক কয়েক ফর্মা ছাপার পর গত সংঘর্ষের সময় বন্ধ হয়ে আছে। এছাড়া মুহাম্মদ আবদুল হাই এর সহিত যুগ্ম সম্পাদনায় তিনি অনার্স ও এম. এ. ছাত্রদের জন্য আরও পাঁচখানি দুষ্প্রাপ্য পাঠ্যবই সম্পাদনা করেছিলেন। কেবল ছাত্রদের প্রয়োজন সাধন লক্ষ্য ছিল, তাঁর পূর্বে-বহুবার-সম্পাদিত গ্রন্থের প্রকাশনায় পাণ্ডিত্য ফলাতে চাননি। তবে দু'একখানা গ্রন্থ শ্রমহীন, চিন্তাশূন্য এবং মৌলিকতাবিহীন নয়। সম্পাদকদ্বয়ের একাজ কোন কোন মহল পছন্দ করেনি, অনেকে ব্যবসায়ী বুদ্ধিপ্রসূত বলে অভিযুক্ত করেছিল, কেউ কেউ স্বতোদ্যোগী হয়ে কার্বন-কপি করে ছাপিয়ে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। বুদ্ধিজীবী মহলে বুদ্ধিচুরির সে এক কাল গেছে। এসব গ্রন্থের অধিকাংশ ঢাকায় এসে নীলক্ষেত ও স্যাভেজ রোডের বাসায় বসে লেখা। আনোয়ার পাশা অনবরত লিখতেন। আমি তাঁর বাসা যেতাম, দেখতাম টেবিলের কাছে তিনি খাতা-কলম নিয়ে লেখার কাজে ব্যাপৃত আছেন। সভাসমিতি, রেডিও, টিভি, ঘুরে তিনি কালক্ষেপ করতেন না। রেডিওর অনেক প্রোগ্রাম তিনি নিতেন না, সরকারের তাবেদারী করতে হতো বলে। ক্লাব কিংবা ঘরোয়া আড্ডা তিনি ভালবাসতেন, কিন্তু সেখানেও তিনি বেশী সময় নষ্ট করতেন না। ঢাকায় এসে বৃহত্তর পরিবেশে আনোয়ার পাশার মনের বিকাশের সুযোগ হয়েছিল, আর তিনি সে সুযোগের পুরামাত্রায় সদ্ব্যবহার করেছিলেন। তিনি অনেক জ্ঞানীগুণী ও কবি সাহিত্যকদের সংস্পর্শে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে কিছু ক্ষণ আলাপ করেছেন যাঁরা তাঁরাই জানেন আনোয়ার পাশা চিন্তার জগতে, কিরূপ মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রগতিবাদী ছিলেন একথা একবাক্যে স্বীকার করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষকদের সাথে এবং মতে তিনি কাজকর্ম করতেন এবং সভাসমিতিতে যোগদান করে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা দান করতেন। খুব সম্ভব, তাই তাঁর জীবনের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর রাজনৈতিক চেতনা কিরূপ ছিল এবং দেশের কিরূপ মুক্তি কামনা করতেন তার একটা দৃষ্টান্ত তাঁর ডায়ারী থেকে দেওয়া যেতে পারে। ১৯৬৪ সাল ২৭শে জানুয়ারী ডাবকাই থেকে লিখছেন, "শেষ পর্যন্ত সুন্দরী বৌ মিলল, বাড়ীঘরও ভরে উঠল। বাড়ীঘর পাহারা দেবার জন্য খুব শক্তিশালী মজবুত গোলাম নিযুক্ত হল। মনিব গোলামটিকে সব কাজেই নিযুক্ত করতেন। গোলাম খুব প্রভুভক্ত অতএব প্রভুর সর্বকার্যে

সাহায্য করতে দ্বিধা করত না সে। প্রভু একদিন ভুল করে বসল। বৌএর সঙ্গে ঝগড়া হলে একদিন গোলামকে ডেকে বৌকে একটু পিটিয়ে দিতে বললে। গোলাম যথারীতি সে কাজ সমাধা করলে, কিন্তু মনটা তার খারাপ হয়ে গেল। একদিন রাত্রে সে তার প্রভুটিকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে প্রভুপত্নীকে জোর করে দখল করে বসল। বেচারা মনিব, গায়ের জোরে সে তো আর গোলামকে তাড়াতে পারবে না।" এটা একটা রূপক; এর ভেদ ভেঙে তাঁর ভাষাতেই বলি, "এই ঘটনাটি ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ঘটেছিল পাকিস্তানে। এখন সেখানে গোলামই নিজেকে প্রভুর আসনের আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেছে।" এর প্রায় সাড়ে চার বছর পরে ঢাকা থেকে খেয়াল-খাতার শেষ পাতায় ঢাকা থেকে তিনি লিখেছেন: "এই দিনটি থেকে অর্থাৎ ১৬ই আষাঢ় থেকে ১৩৭৬-র ১৬ই আষাঢ় পর্যন্ত এই একটি বছরে হাই সাহেবের মৃত্যু, আয়ুব খাঁর পতন প্রভৃতি ঘটনা ঘটে। হাই সাহেবের মৃত্যু আমার জন্য একটি অপরিসীম ক্ষতি। আয়ুব খাঁর পতন দেশের জন্য একটি শুভ ঘটনা।" এর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। বাংলার সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীমহলে ইয়াহিয়া আমলের প্রথম শিকার হলেন হাই সাহেব। মুনীর চৌধুরী হলেন শেষ শিকার। হাই সাহেবের মৃত্যু কেবল ব্যক্তিগতভাবে আনোয়ার পাশার নয় সারা বাঙালীর অপরিসীম ক্ষতি; ঠিক অনুরূপভাবে মুনীর চৌধুরীর মৃত্যুও সারা বাংলার অপরিমেয় ক্ষতি। হাই-মুনীর বাংলাদেশে আর জন্মগ্রহণ করবেন না। অথচ দুজনকেই আমরা বাঁচাতে পারতাম। আরও অনেককে বাঁচাতে পারতাম। পশ্চিমা পশুর সাথে আমাদের ষড়যন্ত্রও কম ছিল না! আমাদের শিক্ষা কবে হবে? আনোয়ার পাশা রাজনীতি করতেন না, কিন্তু রাজনৈতিক মত পোষণ করতেন। আয়ুব খান গেল, ইয়াহিয়া খান এল। বাংলার স্বাধিকারের আন্দোলন চলতে থাকল। আনোয়ার পাশা বাংলাদেশের কল্যাণ কামনা করতেন। তিনি বাংলাদেশকে ভালবাসতেন। এ বাংলা রবীন্দ্রনাথের বাংলা, নজরুলের বাংলা, জীবনানন্দের বাংলা। পাবনায় থাকার সময় ১০ই কার্তিক, ১৩৬৭ সন ডায়ারীর পাতায় তিনি লিখছেন, "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।' এই একটি কথা শুধু বলতে বলতেই জীবনটাকে কাটিয়ে দেওয়া যায়।" এর আগের বছর ডাবকাই থেকে (১৮ই মাঘ, ১৩৬৬ সন) ডায়ারীতে লিখছেন, "বাংলা—আমার বাংলা হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, বাঙালীর বাংলা।" পাবনাতে প্রথম কয়েক বছর ভারতীয় নাগরিকত্ব নিয়েই ছিলেন। পূর্বেই বলেছি, ভিসা-পাসপোর্ট নিয়ে তিনি একবার গোলযোগের মধ্যে পড়েন। ১২ই আশ্বিন, ১৩৬৮ সনের ডায়ারীতে তিনি বলছেন "আমি বাংলার ছেলে তবু বাংলারই একপ্রান্তে ভিসা পেলে তবে থাকতে পাই।---

"স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে এদেশ তোদের নয়'—বাংলাকে স্বদেশ বলার অধিকার থেকে আজ আমি বঞ্চিত। আমি তবু বাঙালী।" শেষের দিকে আনোয়ার পাশা মনে প্রাণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা কামনা করতেন। অন্য সব কারণ ছাড়াও কেবল স্বাধীন হওয়ার আনন্দেই তিনি গত আন্দোলনকে পূর্ণভাবে সমর্থন করেছিলেন। আনোয়ার পাশার জীবন-আকাশে যে ঝড় উঠেছিল তা আরও ঘন, তীব্র হয়ে উঠল। ১৯৭১, ২৫শে মার্চের সেই কালরাত্রি। আনোয়ার পাশা নীলক্ষেতের ২৩ নং ফ্ল্যাটে থাকতেন। পাশেই ইকবাল হল। আনোয়ার পাশা পরিবার নিয়ে মরতে মরতে বেঁচে গেলেন। না, তিনি বাঁচলেন না ; এ কেবল সাময়িক বাঁচা। তারপর দীর্ঘ নয় মাস ধরে মৃত্যু ভয় ও মানসিক নিষ্পেষণের পর্ব চলল। আর পাঁচজনের মত আনোয়ার পাশাও অসহ্য বেদনায় ম্লান হয়ে থাকতেন। অধ্যক্ষ মুনীর চৌধুরীর কক্ষে আমরা বসতাম। তাৎকালিক পরিস্থিতির কথা আলোচনা করে কিছু আশা, কিছু নৈরাশ্যের ভাবনা নিয়ে বাড়ী ফিরতাম। আনোয়ার পাশার মুখ তখনও বিধুর দেখতাম। জাতির ঘোর দুর্দিনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে কিছু করতে পারছেন না বলে এ দুঃখ এ মনোবেদনা। দেশকে তিনি ভালবাসেন, আত্মার মত ভালবাসেন। তবু শেষের দিকে কিছু কাজ করছিলেন তিনি। নিজে দিয়ে এবং চাঁদা তুলে অনেক টাকা মুক্তিবাহিনীর ছাত্রযোদ্ধাদের দিতেন। তাঁর মাধ্যমে আমাদের অনেকে টাকা দিতেন। একখানা গোপন প্রচারপত্রে তিনি নিয়মিত লেখা দিতেন। আভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আনোয়ার পাশা একাজ করতেন। এদিকে খানসেনাপুষ্ট বাঙালী আলবদরের বলির খাতায় তাঁর নাম লেখা হয়ে গেছে। ডিসেম্বরের তিন তারিখে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আর বিভাগে যেতাম না। তাঁর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। কেবল তাঁর বড় ছেলের সাথে দেখা হয়েছিল ; বলেছিলাম, 'তোমার আব্বাকে বল, যুদ্ধ লেগেছে, গ্রামে চলে যেতে।' ঝড় এল। আনোয়ার পাশা বাঁচলেন না, তাঁকে বাঁচান গেল না। মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, রাশিদুল হাসান, ডঃ খায়ের ও অন্যান্যদের মত আনোয়ার পাশাও এক নিষ্ঠুর মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন। তার দুদিন পরে বাংলাদেশ শত্রু কবলমুক্ত হল। স্বাধীন মুক্ত দেশের মুখ তাঁরা কেউ দেখলেন না, অথচ কত সাধ ছিল তাদের। আনোয়ার পাশা মরতে চাননি, মরার বয়স হয়নি তাঁর। সুন্দর পৃথিবীতে সুন্দর হয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রূঢ় পৃথিবী তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে বিদায় দিল। এই পাপ পৃথিবী থেকে আনোযার পাশা বিদায় নিলেন। ভারতে নীড়-সন্ধানীর নায়ক হাসান হাজতে নীড়ের সন্ধান পেয়েছিলেন, পাকিস্তানে আনোয়ার পাশা কবরে নীড়ের সন্ধান পেলেন।

পাবনায় থাকতে আনোয়ার পাশা একদিন খেয়াল-খাতায় খেয়ালবশে লিখেছিলেন, "এটা ভাবতে কেমন লাগে যে আমি বেঁচে নেই। মনে করা যাক আমি মরে গেছি। তারপর অদৃশ্য শরীর নিয়ে দেখে বেড়াচ্ছি আমার জন্য আমার চেনা মহলে কী প্রতিক্রিয়া হয়। তখন যদি কোন রাতে সহসা আবার শরীর ধারণ করে এসে মশারীর কাছে দাঁড়িয়ে মসিনাকে শুধাই—কেমন আছ?' তবে কি করবে মসিনা? ভাবতে কেমন অবাক ঠেকছে যে, এই পৃথিবীতে কিছুকাল পর আমি আর থাকব না।---এই লেখাগুলি থাকবে, এই টেলিব চেয়ার, ঘর সব থাকবে।---আমার কথা একবারও ভাববে না।" কি এক অশুভ ভাবনা আনোয়ার পাশার। এর পাঁচ বছর পর তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আনোয়ার পাশা! তুমি আজকে অশরীরী হয়ে বাংলার আকাশে-বাতাসে ঘুরেফিরে 'চেনা-মহলের প্রতিক্রিয়া' দেখছ কিনা জানি না, তবে এমুহূর্তে একথা বলতে পারি, আমরা তোমার কথা ভাবি, তোমাকে আমরা ভুলিনি, ভুলতে পারব না। স্বাধীন বাংলাদেশ তোমাকে ভুলবে না।

পরিশিষ্ট

আনোয়ার পাশা রচনাপঞ্জী

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

কাব্য নদী নিঃশেষিত হ'লে : প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৩৭০
ষ্টুডেণ্ট লাইব্রেরী, কলিকাতা ; পৃ ৪৮ 'মসিনা'কে
(সহধর্মিনী) উৎসর্গীকৃত।

উপন্যাস নীড়-সন্ধানী : প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৭৫ মওলা ব্রাদার্স,
ঢাকা ; পৃ ২৯৫ 'কারমাইকেল হোষ্টেলের বন্ধুদের'কে উৎসর্গীকৃত।
নিশুতি রাতের গাথা : প্রথম প্রকাশ, কার্তিক, ১৩৭৫
ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ, ঢাকা ; পৃ ৯৪
'আবুল ফজল'কে
উৎসর্গীকৃত।

ছোটগল্প নিরুপায় হরিণী : প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৭৭
ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ, ঢাকা ; পৃ ১৪২ 'রাশীদুল
হাসান'কে উৎসর্গীকৃত।
রবীন্দ্রছোটগল্প সমীক্ষা : প্রথম খণ্ড। প্রথম প্রকাশ,
কার্তিক, ১৩৭০ ইষ্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স,
ঢাকা।
দ্বিতীয় সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৭৬
ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা ; পৃ ২৫১
'আব্বা ও আম্মাকে' উৎসর্গীকৃত।
সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল : প্রথম প্রকাশ, ১লা জুলাই, ১৯৬৮
বইঘর, চট্টগ্রাম,
রবীন্দ্রছোটগল্প সমীক্ষা, ২য় খণ্ড যন্ত্রস্থ

অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ১৫৬

সমুদ্র শঙ্খলতা উজ্জয়িনী	কাব্য
রাইফেল-রোটি-আওরত	উপন্যাস
নেতিগর্ভ। হিমগৃহ	অসমাপ্ত উপন্যাস
খেয়াল-খাতা	ডায়ারী
স্মৃতি-লেখা	অসমাপ্ত আত্মজীবনী

সভাপতির ভাষণ

কবীর চৌধুরী

ডক্টর ওয়াকিল আহমদ আন্তরিকতার সাথে আনোয়ার পাশার অন্তরঙ্গ জীবন ছবি তুলে ধরেছেন।

এই আনুষ্ঠানিক স্মরণ বক্তৃতামালা আমাদের দুঃখের, শোকের আংশিক প্রকাশ মাত্র।

মৃত্যুর পূর্বে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আমরা নিবিড়ভাবে জানতে পারিনি। স্মরণ বক্তৃতা মালায় শহীদদের জীবনের ঘটনা উদঘাটিত হওয়ায় পবিত্র দায়িত্ব সম্পন্ন হয়েছে। অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ আন্তরিকতার সাথে এমনি একটি মহান দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি আনোয়ার পাশার ডায়েরী, বন্ধুবান্ধব এবং লেখা থেকে সব মিলিয়ে একটা গবেষণামূলক জীবন আলেখ্য তুলে ধরেছেন। ডঃ ওয়াকিল আহমদের এই নিষ্ঠা সত্যিই প্রশংসনীয়।

আনোয়ার পাশার সাথে আমার প্রথম পরিচয়, বাংলা একাডেমী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের উপর তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশের পর। আনোয়ার পাশার লেখনী ছিল ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থনে, জনাব পাশা বেঁচে থাকলে আজ তাঁর ধারণার পূর্ণতা লক্ষ্য করতেন।

আনোয়ার পাশা : সাহিত্যকর্ম

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

২৪শে মার্চ শুক্রবার বিকাল ৪টা

আনোয়ার পাশার সংগে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়, সে আজ এক দশকেরও অধিককাল—পাবনা এডয়ার্ড কলেজে তিনি বাংলার অধ্যাপক, এবং আমরা তখন রাজশাহী থেকে ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'পূর্বমেঘ' চালাই। আমাদের একটা বিশেষ লক্ষ্য ছিল নোতুন লেখক খুঁজে বার করা। পশ্চিম বঙ্গ থেকে আগত আনোয়ার পাশা লেখক হিসেবে নোতুন কিনা তা আমাদের জানা ছিল না, তবে নাম-পরিচয়ে তাঁকে আমরা চিনতাম না। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রসাহিত্য বিষয়ক আলোচনার পাঠক এবং বাংলা ভাষা সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের কাছে যে-গ্রন্থটি সুপরিচিত হয়ে ওঠে, সেই 'রবীন্দ্রছোটগল্প সমীক্ষার' প্রথম কিস্তি পাণ্ডুলিপি তিনি ডাকযোগে আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। পরে এ লেখাটি ধারাবাহিকভাবে 'পূর্বমেঘে' প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশে প্রকাশিত এটাই আনোয়ার পাশার প্রথম গ্রন্থ। 'পূর্বমেঘ' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক হিসেবে আজ আমি এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চাই যে, এই শহীদ লেখককে বাংলাদেশের পাঠক সম্প্রদায়ের কাছে পরিচিত করবার প্রথম সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম।

তাঁর দু'এক কিস্তি লেখা প্রকাশের পর রাজশাহীতে তিনি বেড়াতে আসেন। এতদিন পর স্মৃতি মন্থন করতে গিয়ে মনে পড়ছে, পাজামা-পাঞ্জাবী পরিহিত নাতিদীর্ঘ এক তরুণের সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এক ধরনের চেহারা আছে যাকে বলা যায় নিরীহ ভদ্র এবং ভানবর্জিত। এ চেহারা দ্বিতীয়জনকে বা সভাজনকে হাঁকাহাঁকি করে ডাকে না। আমার বেশ স্পষ্ট মনে পড়ছে, সেই বিরল চেহারার একজন ভদ্রলোকের সংগে পরিচিত হলাম। আরো মনে পড়ছে, তাঁর চোখ জোড়া আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। এ রকম বাঙ্ময় চোখ আমি কচিৎ দেখেছি। এ চোখ কবির, ভাবুকের, স্বাপ্নিকের। তখন জানতাম না আনোয়ার পাশা কবিতা লেখেন।

আনোয়ার পাশার সাহিত্যকম বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রধানতঃ তাঁর এই কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে বড়ো হয়ে দেখা দেয়ঃ

ক. সাহিত্যের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বৈচিত্র্যের সন্ধানী।

খ. উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্তরে তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না, এবং সে উদ্দেশ্য অর্জনের কাজে বিস্ময়করভাবে অপরিসীম শ্রম-সাধনে কদাপি তিনি পশ্চাদ্‌পদ হননি।

গ. সাহিত্যকর্ম-সাধনায় সব্যসাচীর ক্ষমতা তাঁর করায়ত্ব ছিল।

বস্তুতঃ বিচিত্রের প্রতি আগ্রহ তাঁকে সাহিত্যের নানা অঙ্গনে ব্রতী হতে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। আমাদের সাহিত্যিক সহকর্মীদের মধ্যে এমন সমন্বয় বিরল।

একদিকে তিনি যেমন সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য রচনায় আগ্রহী ছিলেন, অপর দিকে তেমনি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনায় এবং আদি ও মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্য বিষয়ক গবেষণার কাজে তিনি নিরলস সাধনা করে গেছেন। কালের হিসেবে কতো দিনই বা সাহিত্য কর্ম সাধনার সুযোগ পেলেন, এরই মধ্যে আনোয়ার পাশা রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থরাজির সংখ্যা নিতান্ত স্বল্প নয়।

বন্ধু এবং সহকর্মীকে অকালে হারিয়েছি বলে আমরা দুঃখ করব, একজন পণ্ডিত শিক্ষকের তিরোধানে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ক্ষতি অপূরণীয়, তাঁর আত্মীয় পরিজনের শোক ও ব্যথার পরিমাপ করবে কে—এ সবই সত্যি ; এতদ্‌সহ এ কথাটাও আজ বিশেষ করেই বলবার, সাহিত্যের অনুরক্ত পাঠক সম্প্রদায় দ্বিতীয়বার আর তাঁকে ফিরে পাবেন না। বিচিত্রের পথাভিসারী এই শিল্পীর কর্ম-সাধনা বিকশিত হওয়ার অতি অল্পকালের মধ্যেই খণ্ডিত হয়ে গেল। যে বয়েসে তাকে আমরা হারালাম এবং ইতিমধ্যেই ,যে সম্ভাবনার স্বাক্ষর তিনি রচনা করেন, স্বভাবতঃই আমরা ভাবব এবং আক্ষেপ করব, আরো কতো কী যে দান করবার মতো তাঁর ছিল।

আমার আশংকা হয়, মৃত্যুর পরবর্তী এই মাস কয়েক মাত্র কাল, ব্যবধানে শহীদ আনোয়ার পাশার সাহিত্য কর্মের শিল্পগত মূল্যায়ন হয়ত বা সম্ভব নয়। তাঁর সংগে আমাদের ব্যক্তি সম্পর্কের স্মৃতি এত স্পষ্ট জাগ্রত যে, তা অতিক্রম করা এক প্রায় দুঃসাধ্য কর্ম। তাঁর জন্যে আমাদের শোক, তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আর প্রেমে আমাদের হৃদয় এখন উদ্বেল। এই আবেগ আমাদের সাহিত্য রসগ্রহণের ক্ষমতাকে প্লাবিত করে যাচ্ছে। এ কারণে বর্তমান পরিসরে সতীর্থ বন্ধুর রচনাবলীর একটা খসড়া পরিচয় প্রকাশের চেষ্টা করা যাচ্ছে।

কালের দিক থেকে আনোয়ার পাশার প্রথম প্রকাশিত বই, তাঁর কবিতা সংগ্রহ 'নদী নিঃশেষিত হলে'; বইটির প্রকাশ কাল শ্রাবণ, ১৩৭০, ইংরেজি ১৯৬৩ সাল। তারপর থেকে মাত্র বছর ছয়েকের মধ্যে তাঁর বাকী সমগ্র গ্রন্থরাজি প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়গত দিক দিয়ে তাঁর সাহিত্যকর্মকে এভাবে ভাগ করা যেতে পারে ; ক. সৃষ্টিধর্মী রচনা : কবিতা ও উপন্যাস ; খ. আলোচনা-মূলক রচনা ; গ. জীবনী ও আলোচনা ; ঘ. গবেষণা ও সম্পাদনা কর্ম।

অন্যত্র উল্লেখ করেছি, আনোয়ার পাশার সংগে প্রথম সাক্ষাতের কালে জানতাম না, তিনি কবি। তবে তাঁর চোখে মুখে কবি-পরিচয়ের আভা দীপ্যমান দেখেছি। এই 'কবি' কথাটার মানে কি—তিনি কি রোমাণ্টিক, স্বাপ্নিক? এই জন্যেই কবি? 'নদী নিঃশেষিত হলে' বইটি পড়তে পড়তে বারংবার প্রশ্নটা ভেবেছি। অতঃপর তাঁর সম্পর্কে প্রথম দর্শনের ধারণা পাল্টাবার কোনো হেতু পাই নি। এই ভেবে কেবল বিস্মিত হয়েছি, 'নদী নিঃশেষিত হলে'র কবি পরবর্তী কালে কী করে ভাষা ব্যাকরণ গত তাত্ত্বিক আলোচনায় ও কূটতর্কে নিবিষ্ট-চিত্ত হতে সমর্থ হয়েছিলেন? সে যাই হোক, তাঁর কবিতাবলী পাঠ করে আমাদের মনে হয়, আনোয়ার পাশার কবিসত্তা অবশ্যই রোমাণ্টিক। কথাটা ব্যাখ্যা করা দুরূহ, অনুভব করতে পারি। তাঁর রোমাণ্টিক কল্পনার সংগে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়েছে প্রেম—প্রকৃতি প্রেম, জীবনের প্রতি প্রেম, বাংলা দেশের প্রতি প্রেম—

ক. দেখি, বাতাসে বনের পাতা ওড়ে,
মেঘ জমে পৃথিবীর দূরান্ত শিয়রে।
পেরিয়ে যাই জনতাকে, জনাকীর্ণ প্রান্তরের একা বকটিকে
ভালোবাসি। পথে দেখা মেলে না সে মুখ
রাঙা ঠোঁট, কালো চোখ, যৌবনের স্নেহস্ফীত বুক
সবি তার সংসারের ঘরে ঘরে মেলে।—
দোলনায় কচি শিশু, প্রেমের আঙিনা আর
ঈশানে আম্রশাখা হেলে
কবুতর-বসা ছাদে ছায়া দেয়। দেখি সব।
[পথে পথে]

খ. বিপুলা এই বাংলাদেশে একটি আছে ঘর,
মাধবী দোলে অচেনা ডালে, গুঁড়িতে বাঁধা গাভী।
কাজে-অকাজে আঙিনা জুড়ে এক জনারই দাবি।
একাই সে এ-সংসারের তুলসীমূলে যেন
সাঁঝের শিখা নীরবে জ্বলে—শান্ত সুন্দর :

সেই আমার চিরদিনের পরম নির্ভর
কী নাম তার কি পরিচয় নাই বা জানিলাম।

পৃথিবী ঘুরে এখনো মেলে একটি আহা ঘর
সেই আমার সহসা-পাওয়া কদমঝুরি গ্রাম

[জর্নাল থেকে]

কবিকে এ প্রেম করেছে আশাবাদী। আশা তাঁর জীবনের অমরতার জন্যে, আগামী ভবিষ্যতের জন্যে। লক্ষ্যণীয় যে, তাঁর একটি কবিতার শিরোনাম 'পেসিমিজম্'-এর বিপক্ষে'। 'নদী নিঃশেষিত হলে' এই বিশেষ কবিতায় কম প্রত্যক্ষ করছেন: নদী নিঃশেষিত হ'ল, মেঘরিক্ত প্রত্যহের অগ্নিস্নানে মাটি ধুলোয় পরিণত হচ্ছে; এবং দীর্ঘ পিপাসার ঋতু ঘূর্ণি হাওয়ায় রৌদ্রে পথে পথে সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে। এ সবি ত' সত্যি। কিন্তু এতদসত্তেও

জলের শেওলা তবু বাঁচবার বিচিত্র প্রয়াসে
একটি ফুল ফুটিয়েছে এই রুক্ষ অসম্ভব মাসে।
... ...
এখনো সজল আশা আছে তবে কোমল মাটি ও তৃণমূলে।
এখনো তা হ'লে বোনো বুনোচরা গ্রামের আশায়
বর্ষার আশায় মাঝি নৌকো সারে। পার হবে এ পারের লোক।
এখন রৌদ্রে বুঝি রাঙা হ'ল পৃথিবীর একটি অশোক।

'বোধিবৃক্ষ' কবিতায় কবি খুঁজেছেন সেই বোধিবৃক্ষ, 'যার ডালে, শ্বেত-কপোতেরা ডানা মেলে আসে; যেখানে অত্যন্ত কাছে কল্লোলিত অমিত আশ্বাসে অন্ততঃ একটি নদী---।'

পৈশাচিক নিপীড়নের মৃত্যু ব্যক্তি কবিকে অপসারিত করেছে, কিন্তু কী ব্যাকুল আগ্রহে জীবনকে তিনি ভালোবেসেছিলেন---

আজকে আলোতে বাতাসে কবিতা নেই
তবু ভালো লাগে হাসতেই, বাঁচতেই।

অনুরূপ আরেকটি অংশ---

এই মাটিতে এখনো আছে বেঁচে থাকার মানে, এইভাবে আমরা লক্ষ্য করব: প্রেম, আশা, আশ্বাস, জীবন আর শ্বেত কপোতের শান্তি—এই হচ্ছে 'নদী নিঃশেষিত হলে' কবিতা সংগ্রহের মুখ্য বাণী।

আনোয়ার পাশার সাহিত্যকর্মের পরিচিতি প্রসংগে অতঃপর আমরা দু'টো উপন্যাসের নাম করব: 'নীড় সন্ধানী' এবং 'নিশুতি রাতের গাথা'। উভয়েরি

প্রকাশকাল বাংলা ১৩৭৫, ইংরেজি ১৯৬৮। বলা দরকার, ভৌগোলিক বা সামাজিক বাংলাদেশ তাঁর এ উপন্যাস দুটির পটভূমি নয়। আমরা জানি আনোয়ার পাশার পৈতৃক বাসভূমি পশ্চিম বাংলায়। তিনি লেখাপড়া শিখেছেন সেখানে এবং তাঁর কর্মজীবনের প্রথমাংশ অতিবাহিত হয়েছে পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদে। সে দেশের অভিজ্ঞতাই উক্ত উপন্যাস দু'টিতে বিধৃত। পশ্চিম বাংলার রাজনীতি, বিশেষ করে সেখানকার হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ঔপন্যাসিকের বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাঁর নায়ক মুসলমান, সে দৃষ্টিতেই আনোয়ার পাশা সেখানকার মধ্যবিত্ত মুসলমান জীবনের সমস্যা, দ্বন্দ্ব, সংঘাতকে রূপায়িত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। সাহিত্যের মানদণ্ডে উপন্যাস দু'টির আত্যন্তিক মূল্য কতটা, সে অন্য বিচার, তবে বাংলাদেশের সাধারণ পাঠকের কাছে 'নীড় সন্ধানী' এবং 'নিশুতি রাতের গাথা' প্রতিবেশী দেশের এক জীবন কাহিনীর দ্বার উন্মোচন করে দেবে।

আনোয়ার পাশার আলোচনামূলক গ্রন্থ 'রবীন্দ্রছোটগল্প সমীক্ষা' আমাদের কাছে তাঁর সবচাইতে উল্লেখযোগ্য রচনা বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সম্পর্কে আলোচনা সংখ্যায় কম প্রকাশিত হয়নি, যথার্থই মূল্যবান আলোচনার সংখ্যাও কম নয়। এতদ্‌সত্ত্বেও, এ গ্রন্থের একটি বিশেষ মূল্য এইখানে যে, বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনার পথিকৃৎ আনোয়ার পাশার 'রবীন্দ্রছোটগল্প সমীক্ষা'। এতাবৎকাল আমরা ক্লাশে কিংবা সভায় বক্তৃতা প্রসংগে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প নিয়ে কথা বলেছি। এবং সে কাজটা করেই আমাদের দায় সেরেছি। কিন্তু গত দু'যুগে ক'জনা প্রকৃত রসগ্রাহীর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিচার করেছি, গ্রন্থরচনা করেছি? অবশ্যই আমরা রবীন্দ্রপ্রেমিক, রবীন্দ্রসাহিত্যকে বুঝতে চাই—কিন্তু সে কাজটা যে করিনি, তা কী উদ্যোগের অভাবে অথবা দুঃশাসনের শাসনকালে সাহসের অভাবে? শহীদ আনোয়ার পাশার সে দুঃসাহসী উদ্যোগ ছিল।

'রবীন্দ্রছোটগল্প সমীক্ষা'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক তাঁর গ্রন্থ রচনার কারণ বিবৃত করছেন এইভাবে: 'রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে মনের মধ্যে যে একটা গভীর সাড়া অনুভব করেছিলাম, তারই ফল আমার এই গ্রন্থখানি। রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে-কোন একটি দিকের সম্পর্কে কিছু লিখব এবং সেই হবে রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ পূর্তিতে কবিগুরুর উদ্দেশ্যে আমার হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য—এমনি একটা আর্তি ছিল সেদিন মনে।' তিনি আরো লিখছেন, 'কোনো দুর্মর পাণ্ডিত্যের দম্ভ নিয়ে এ বই আমি লিখিনি। আমার ভক্তি ভালোবাসা এবং বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে

কবি গুরুকে সমগ্র সত্তায় উপলব্ধি করতে চেয়েছি শুধু।' রবীন্দ্র উপলব্ধির কাজে আনোয়ার পাশা প্রকৃতই কতটা সার্থক হয়েছেন সে মূল্যায়ন বিচারকের; তবে, এ কথাটা নির্দ্বিধায় বলতে চাই যে, কবিগুরুর প্রতি তাঁর অন্তরের ভক্তি-ভালোবাসা অকৃত্রিমভাবেই উৎসারিত হয়েছে এ গ্রন্থে। পাঠক হিসেবে আমার নিজের কাছে বিশেষ করে ভালো লেগেছে 'দেশ-কাল' নামক অধ্যায়টি। উনবিংশ-বিংশশতাব্দীর বাংলাদেশের পটভূমিতে রবীন্দ্রছোটগল্প বিচার রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক প্রয়াস। উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য গ্রন্থটি সে প্রয়াসের স্বাক্ষরে উজ্জল। এবং এ বাংলায় সম্ভবতঃ আনোয়ার পাশাই এ পথের প্রথম দিশারী। তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব এইখানে।

আনোয়ার পাশার আরেকটি বিশেষ উল্লেখ করবার মতো বই 'সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল।' লেখক-সমালোচক মহলে সাধারণতঃ মনে করা হয়ে থাকে, জীবিত লেখক সম্পর্কে কিছু লেখা দুরূহ কর্ম। কথাটা বহুলাংশে সত্যি। আনোয়ার পাশা সেই দুরূহ কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন। 'সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল' পাঠ করে সানন্দে আমরা লক্ষ্য করেছি, তিনি যে শুধুমাত্র দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তা নয়, কঠিন সে সাধনায় সিদ্ধিও তাঁর করায়ত্ত হয়েছে।

প্রথমত:, বলা দরকার, এ গ্রন্থ নিছকই জীবনী আলোচনামূলক নয়, কিংবা আবুল ফজলের সাহিত্যকর্ম বিশ্লেষণেও এ গ্রন্থ সীমায়িত নয়। এককালের বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য আন্দোলনের, তৎকালীন মুসলিম মানসের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের, বিদ্রোহের ও প্রতিক্রিয়ার পরিচিতি গ্রন্থটির মূল্যবান সম্পদ। দ্বিতীয়তঃ, বিগত কয়েক বছরে আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের আন্দোলনে আবুল ফজল নির্ভীক নেতৃত্ব দান করেন---একথা সবারি জানা; আজ তিনি আমাদের কাছে একজন ব্যক্তি বিশেষ মাত্র নন, তাঁকে বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ সাহিত্যশিল্পী বললেও সবটা বলা হয় না, তিনি ছিলেন আমাদের সে সংগ্রামের অন্যতম প্রেরণা-উৎস। এ কারণেই অধ্যক্ষ আবদুল হাই বলেছিলেন যে, তাঁর সম্পর্কে বই প্রকাশিত হওয়ার সময় এসেছে। আবুল ফজলের মন ও মানসিকতার সংগে আনোয়ার পাশা সম্ভবতঃ তাঁর নিজের একটা সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। সর্বপ্রকার সংস্কার-বিরোধিতা, বুদ্ধির মুক্তি, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সর্বোপরি, স্বাজাত্য অভিমান ও বাংলা ভাষা সাহিত্য, বাঙালী সংস্কৃতির প্রতি মমত্ব---এই সকল ক্ষেত্রে উভয় শিল্পীর আত্মীয়তা আমরা লক্ষ্য করতে পারি। ফলে উল্লিখিত গ্রন্থটি শুদ্ধমাত্র তত্ত্ব, তথ্য ও বিশ্লেষণ নির্ভরতাতেই সমাপ্ত হয় নি, আবুল ফজলের মূল্যায়ন করতে গিয়ে আনোয়ার পাশা নিজের বিশ্বাসকেই ভাষাদান করেছেন। তিনি লিখছেন: 'সংকীর্ণমনা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি দেশকে যখনি মধ্যযুগীয় চোরাবালিতে নিয়ে

ফেলার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে এবং দেশের সাহিত্যসংস্কৃতিকে তাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির হাতিয়ার করতে চেয়েছে তখন অতন্দ্র দেশপ্রেমিক আবুল ফজলের লেখনী সোচ্চার প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে। দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অশুভের আবির্ভাবের বিরুদ্ধে আজো তিনি একজন সতর্ক প্রহরীর ভূমিকায় সদাসক্রিয়।'

গবেষণা ও সম্পাদনা কর্মে আনোয়ার পাশা অধ্যক্ষ আবদুল হাই-এর সহ-যোগী ছিলেন। তাঁদের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 'মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান', 'বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য', 'চর্যাগীতিকা', 'ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা'। প্রত্যক্ষতঃ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীর প্রয়োজন মেটাবার তাগিদেই তাঁরা এই কাজে হাত দেন। পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক আমলে যখন বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত পঠন-পাঠনের দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছিল, সেই দুর্দিনে সম্পাদকদ্বয় উপরোক্ত গ্রন্থসমূহ সহজলভ্য করবার প্রয়াস পান। 'মান-সিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান'-এর ভূমিকায় তাঁরা লিখছেন: 'কাব্যধারার ও বাংলা ভাষার বিবর্তনের দিক থেকে ভারতচন্দ্রের পঠন পাঠন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় নানা কারণে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতচন্দ্রের কাব্য আজ দুষ্প্রাপ্য। সে জন্যে অন্নদামঙ্গল কাব্য থেকে আমাদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত অংশটুকু মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান নামে সম্পাদন করে প্রকাশ করা গেল।' আর আর গ্রন্থসমূহ সম্পর্কেও এই উক্তি প্রযোজ্য। পুস্তক-দুর্ভিক্ষের পাকিস্তানী আমলে ছাত্র-ছাত্রীরা আবদুল হাই আনোয়ার পাশা সম্পাদিত এই সব অপরিহার্য গ্রন্থাদি পাঠ করে উপকৃত হয়েছেন, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

তবে, এতদসহ আরো একটি কথা বলা দরকার। উক্ত গ্রন্থসমূহ সম্পাদনা করতে গিয়ে সম্পাদকদ্বয় বাংলাদেশের ইতিহাস এবং সমাজজীবনের প্রতি পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যেমন চর্যাগীতিকা সম্পাদনা প্রসংগে তাঁরা মন্তব্য করছেন, 'তৎকালীন দেশ-কাল ও সমাজ জীবনের নানাবিধ পরিচয়ে চর্যাগীতিকাগুলি সমৃদ্ধ। এ গুলির মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের অতীতকে যেন জীবন্তরূপে স্পর্শ করতে পারি।' বস্তুতঃ দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংগে, সমাজজীবনের ক্রমবিবর্তনের সংগে পরিচয় জাতীয় জীবন গঠনের বড়ো সহায়ক। সে কারণে আদি যুগ থেকে বহমান সাহিত্য-ধারাকে স্বীকার করতেই হবে। চর্যাগীতিকা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ভারতচন্দ্রের কাব্য আর ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাবলী সম্পাদনার মাধ্যমে সে ধারাকে বাংলাদেশের আধুনিক পাঠক সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। অন্যতম সম্পাদক আনোয়ার পাশা এ মহান দায়িত্ব

সর্বাংশে পালন করেছেন। স্বাধীনতার ঊষালগ্নে বাঙালি জাতি কৃতজ্ঞতার সাথে তা স্বীকার করবেন।

এ প্রশ্নটা আমি অনেক ভেবেছি, আনোয়ার পাশাকে হত্যা করা হল কেন? পাদপ্রদীপের আলোকে উজ্জ্বলিত যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তিত্ব, সহজেই যারা পিশাচ-শক্তির দৃষ্টিগোচর, তিনি কী সেই মুষ্টিমেয়ের অন্যতম? অথবা, দুর্ভাগ্যক্রমেই তিনি বর্বরের অন্ধ, নির্বিচার হামলার শিকারে পরিণত হন? এর জবাব আইনের তদন্ত সাপেক্ষ।

তবে সাহিত্য-পাঠক হিসেবে এ নিদারুণ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে চাই অন্যত্র। আমার মনে হয় বাংলা সাহিত্য প্রীতি, বাংলা সাহিত্য-সাধনার জন্যেই জীবন দিয়ে তার চরম মূল্য দিতে হয়েছে তাঁকে। লক্ষ্যণীয় যে, আনোয়ার পাশার প্রথম উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম 'রবীন্দ্রছোটগল্প সমীক্ষা'; পরবর্তী কালের কয়েকটি সম্পাদিত গ্রন্থ; 'চর্যাগীতিকা', 'বড়ু চণ্ডী দাসের কাব্য', 'মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান', 'ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ' ইত্যাদি। বলাবাহুল্য এই সব রচনা বাংলা সাহিত্যের অমর সম্পদ। এবং আনোয়ার পাশার সাহিত্য-সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আবহমান কালের বাংলার কাব্যকে দেশের পাঠক সাধারণের কাছে তুলে ধরা, রবীন্দ্রসাহিত্যকে পাঠকমনে ছড়িয়ে দেওয়া। অন্য দিকে বিগত চব্বিশ বছর ধরে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠির সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল: কী করে বাংলা দেশের ভাষা-সাহিত্য সংস্কৃতিকে নস্যাৎ করে দেওয়া যায়। ঔপনিবেশিক শক্তি তার শোষণের শাসনমূল দৃঢ় করবার উদ্দেশ্যে যে সর্বব্যাপক প্রয়াস চালিয়ে আসে বাঙালীকে তার 'সাহিত্য-ঐতিহ্য' থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র ছিল তার অন্তর্গত। এ সব কথা আমাদের সবারি জানা। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে যে, আনোয়ার পাশার গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে সেই সময়ে দেশে যখন নাগরিক অধিকারের উপরে, সাহিত্য-সংস্কৃতির ওপরে আইয়ুব-ইয়াহিয়া শাসনের নিপীড়ন চলছিল। আমরা ত ভুলে যাইনি, তখন চর্যা-শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন অন্নদা মঙ্গল পাঠ কিংবা ঈশ্বরগুপ্তের মতো কবির কবিতা পাঠ ছিল পাপের অধিক; রবীন্দ্রপ্রেমিকদের প্রকারান্তরে চিহ্নিত করা হয়েছিল দেশদ্রোহীরূপে। আমাদের যাঁরা রবীন্দ্রকাব্যকে ভালবেসে এসেছেন, যাঁরা রবীন্দ্র সায়রে অবগাহন করে বাংলাদেশকে, বাংলা ভাষা-সাহিত্যকে ভালবাসবার চেতনা ও প্রেরণা লাভ করতে চেয়েছেন, তাঁদের সবার জন্যে সে অধিকার দাবী করেছিলেন আনোয়ার পাশা; এবং সে কারণেই আত্মাহুতি দিতে হ'ল তাঁকে। বাংলার কাব্য আর রবীন্দ্র সাহিত্যের জন্যে তাঁর যে প্রেম, সে প্রেমের ঋণ তাঁকে শুধতে হল নিজের জীবনের বিনিময়ে।

সভাপতির ভাষণ

মুহম্মদ এনামুল হক

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের "শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও আনোয়ার পাশা বক্তৃতা মালায়" তাঁদের জীবনী ও সাহিত্য কর্ম সম্বন্ধে আলোচনার জন্য বাংলা-বিভাগ সপ্তাহব্যাপী যে-বক্তৃতামালার আয়োজন করেছেন, তাঁর একটিতে, তথা আনোয়ার পাশার সাহিত্য-কর্মের আলোচনা-সভায়, আমাকে সভাপতিরূপে যোগদান করতে অনুরোধ করা হয়েছে। এমন অবস্থায় নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে সভাপতি সচরাচর নিজেকে ভাগ্যবান ব'লে মনে ক'রে উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ দিয়ে থাকেন। কিন্তু আমার কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মুনীর ও আনোয়ার আমার ছাত্র ছিল এবং মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ছিলেন আমার দীর্ঘদিনের কনিষ্ঠ সহকর্মী। আমার নিরতিশয় দুর্ভাগ্য যে করুণতম অবস্থায় আমাদের চোখের সামনে তাঁদের শাহাদত বরণের পর, আজ আনোয়ার পাশার 'সাহিত্যকর্ম' সম্বন্ধে আমাকেই বলতে হচ্ছে। আমার মন এখন গভীর দুঃখভারাক্রান্ত ও চক্ষু অশ্রুসজল। আমি বল্‌ব কি বল্‌তে পারিই বা কি?

আনোয়ার পাশা তাঁর স্বল্পকালীন জীবনে বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যকে যা দান করেছে, আমার প্রাক্তন সহকর্মী জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্‌লা বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সাহেব তার একটা রূপ-রেখা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাতে তিনি পাশার 'সাহিত্য-কর্মের' কোন মূল্যায়ন করেননি। এ-সম্বন্ধে ডক্টর মুস্তাফার স্পষ্ট স্বীকৃতি হচ্ছে, "পাশার 'সাহিত্য-কর্মের' মূল্যায়ন এখন সম্ভব নয়।" এ-সম্বন্ধে আমি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

এ কথা ছেড়ে দিয়েও বলতে পারি, এরই মধ্যে অর্থাৎ তার স্বল্পকালীন জীবনে আনোয়ার পাশা একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছে, বেশ কিছু ছোটগল্প লিখেছে, দু'-খানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস ছেপেছে, সাহিত্যিক আবুল ফজল সম্বন্ধে একখানা পূর্ণাঙ্গ বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনা-গ্রন্থ রচনা করেছে এবং চারখানি বাঙ্‌লা

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য-গ্রন্থ মরহূম অধ্যাপক আবদুল হাই-এর সহযোগিতায় সম্পাদিত ও প্রকাশিত করেছে। এর থেকেই দেখা যাবে, বাঙ্‌লা সাহিত্য-জগতে পাশার বিচরণ ক্ষেত্র ইতিমধ্যে কতখানি সম্প্রসারিত হয়েছিল। সাহিত্যের এই বিস্তৃত ক্ষেত্রে পাশা যে-পদচিহ্ন অঙ্কিত করেছে, তা যে তার আয়ুষ্কাল থেকে দীর্ঘস্থায়ী হ'বে, তা আমি জোর করেই বল্‌তে পারি।

স্বষ্টিশীল সাহিত্যের জগতে সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশে 'এক্সিস্টেনশিয়ালিজম' (Exislentialism) নামে এক নতুন সাহিত্যতত্ত্ব জন্ম নিয়েছে। পাশা তার বিশেষ অনুরাগী ছিল। তার স্বষ্টিশীল সাহিত্যে, বিশেষ করে কবিতায়, এ তত্ত্বের 'প্রয়োগ ও বিকাশে' (আমার কথায় 'আমদানিতে') সে তৎপর ছিল বলে বেশ কয়েক বছর আগে আমাকে জানিয়েছিল। এ-তত্ত্ব সম্বন্ধে বাঙ্‌লা ও ইংরেজীতে দু'-একটি ছোটখাট লেখা দেখেছি এবং পাশার কাছ থেকেও তত্ত্বটিকে বুঝে নেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তত্ত্বটি আজও আমার মাথায় ঢোকেনি। তাই, তত্ত্বটি তাঁর লেখায় কতখানি অভিব্যক্ত হয়েছে এবং তা হ'য়ে থাকলেও তার মানস-রসে জারিত হ'য়ে কোন্ রূপ ধারণ করেছে, সে কথা বলার সাধ্য আমার নেই।

শেখার ও জানার আগ্রহ ছিল আনোয়ার পাশার মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রবল। ছাত্রাবস্থায় তার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি, শিক্ষক-জীবনেও তার সে কৌতূহল অক্ষুণ্ন ছিল। সে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্‌লা-বিভাগের ভাল শিক্ষকদের মধ্যে একজন। তার ছাত্র-ছাত্রীরাই এর সাক্ষী। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্য সম্পাদনের কাজে সে হাত দিয়েছিল এই ভাল শিক্ষক হবার প্রেরণা থেকেই। এতে সে কি পরিমাণ সাফল্য লাভ করেছে, তার পরিমাপ না ক'রেও বলা যায়, এতে তার সততার কোন অভাব ছিল না। এ কাজে হাত দিয়ে সে নিজেও শিখেছে, ছাত্রদেরও সাহায্য করেছে শিখ্‌তে। আমি তার যাবতীয় 'সাহিত্য-কর্মে' এই সততারই পরিচয় পাই। যা সে দেখেছে, যা তার সংবেদনশীল মনে সাড়া জাগিয়েছে, সে তাকে যথাযথ রূপ দিতে চেষ্টা করেছে। সে চেষ্টায় আর যাই থাক, ব্যর্থতার পরিচয় নেই।

পাশার ''সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল'' আমারই পরামর্শে রচিত হয়। এর আগে সে আর কোন সমালোচনামূলক গ্রন্থ রচনায় হাত দেয়নি ব'লে মনে সাহস পাচ্ছিল না। আমি তার মনে সাহস যুগিয়েছিলাম। যখন বইখানি লেখা হ'ল, দেখা গেল, এটি শুধু আবুল ফজলের নিছক জীবনী কিংবা নিছক পেশাদারী সমালোচনা-গ্রন্থ হয়নি; হ'য়ে উঠেছে ফজল সাহেবের লেখায় তাঁর সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মচেতনার, এক কথায়, ঢাকার এককালীন 'মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের' মৌল সদস্য ও চিরপ্রবক্তা আবুল ফজলের মানস-লোক ও মননশীলতার একখানি ভাল ছবি। কোন জীবিত

সাহিত্যিকের সাহিত্য-কর্মের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় সম্ভব নয়। এতে আবুল ফজলের সাহিত্যকর্মেরও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নেই; তবে তাঁর সাহিত্য-কর্মের একটি মৌলিক ও প্রামাণ্য পরিচয় রয়েছে যদিও তা পূর্ণাঙ্গ নয়। ভবিষ্যতে যাঁরা এ-কাজে হাত দেবেন, এ বই তাঁদেরকে পথ দেখাবে। বলা আবশ্যক যে, এ কাজের প্রস্তুতি পর্বে পাশাকে চট্টগ্রামে গিয়ে প্রায় এক সপ্তাহ কাটাতে হয় ফজল সাহেবের সাহচর্যে। তখন সে তাঁর বইয়ের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা করে। কোন সমালোচক বা লেখককে তেমন সততার সাথে কাজ করতে বড় একটা দেখিনি।

আনোয়ার পাশা ছিল একটা স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভা। যে প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হল না, তার সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবে যে স্বাভাবিক সারল্য ও আন্তরিক সততাকে সম্বল ক'রে জীবনের কুটিল পথে সে যাত্রা শুরু করেছিল এক মহান লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য, তাতে সে প্রত্যাশিতভাবেই পৌঁছে যেত। করুণতম দুরদৃষ্ট বশে তা হ'ল না। এ দুরদৃষ্ট তার, তার পরিবার পরিজনের, আর আমাদের সকলের।

আমি পাশার কাছ থেকে আশা করেছিলাম অনেক। অকালে তার শাহাদত বরণে তাই আমার হতাশাও হয়েছে প্রচণ্ড। আজ কবিগুরুর ভাষায় মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করছি:

'হে ফুল না ফুটিতে ঝরিল ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা,
জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা।'